

বি ই কলেজ ১৯৮২ । ই-ম্যাগাজিন সংখ্যা-২ । আগস্ট ২০২১

Curation । Khairul Basar । Shaktimoy Goswami । Subhamay Ghoshal । Kausik Sengupta

নির্মাণ ।খাইরুল বাসার ।শক্তিময় গোস্বামী ।শুভময় ঘোষাল ।কৌশিক সেনগুপ্ত



পাতায় পাতায় । On Other Pages

বি ই কলেজ ১৯৮২ ।ই-ম্যাগাজিন সংখ্যা-২ ।আগস্ট ২০২১

B E College 1982 ।E-Magazine Issue-2 ।August 2021



প্রচ্ছদচিত্র-গ্রাহক

আনন্দরূপ গোস্বামী, বাবা শক্তিময় গোস্বামী (মেকানিকাল), ঢাকার পাঠশালা (South Asian Media Institute) থেকে ফটোগ্রাফি শিখে, সেটা অবলম্বন করে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্পাদকীয় টিমকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আনন্দরূপ ক্যাম্পাসের বেশ কয়েকটি ছবি তুলে দিয়েছে।



না বলা কথা I Unspoken Words

খেজুর হোক বা নেহাৎ আতা, কোন ব্যাপারেই পিছিয়ে নেই এই ই-ম্যাগ। রেপুটেশন প্রায় আনন্দবাজারের সমগোত্রীয়। পড়লে তুমি বস।না পড়লে তোমার লস।ইউনেস্কো প্রেস বিবৃতি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে।

এমন 'দ্য টেলিগ্রাফ' গোত্রের যার আনপুটডাউনেবিলিটি তার নয় নয় করে দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোলো।এ বড় কম কথা নয়।

পাছে লেখা দিতে হয় এই ভয়ে কেউ কেউ ফোন ধরছেন না, কারো আবার হোয়াটসঅ্যাপ নিষ্ক্রিয় করার কথা বিবেচিনাধীন। কিন্তু তাদের বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিরাশির লেখা শিকারী। অতএব সাধু সাবধান।কথা দিয়ে কথা না রাখা কোনো কাজের কথা নয়।

Make-no-mistake, modesty takes a back seat when this e-magazine gets forwarded in WA.
With all humility, we assert that this publication can beat any unputdownable broadsheet in readership, although it doesn't matter to those who BARC.
And, make-no-mistake, this second appearance is always a confirmation that the end is afar.

There is a frenetic effort to not get published in BEC82 E-magazine, but again, make-no-mistake, the hunters are on prowl, and will hound you out.
Amen!



উত্তরণ । শেখরেন্দু রায়চৌধুরী

অর্চনার সুখের সংসার ।স্বামী অভিষেক এক নামী প্রাইভেট কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ।মেয়ে অন্তরা প্রথম সন্তান।সে দু'বছর হল বিয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে নেদারল্যান্ডস বাসী ।ছেলে আকাশ ছোট ।আর্কিটেকচার এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, শিবপুর আই আই ই এস টি তে ।

সময় গড়িয়ে চলে নিজের তালে ।দিন আসে, দিন যায় ।অর্চনা আর স্বামী অভিষেক আগামী দিনের ছবি নিয়ে কল্পনার জাল বোনে ।নাতি- নাতনী নিয়ে খেলবে, ছেলে পাশ করে চাকরিতে ঢুকবে ।এইসব সাধারণ চিন্তা-ভাবনা।

কিন্তু জীবনের রাস্তায় কোন বাঁকে কার জন্য কি অপেক্ষা করে, সে তো কেউ বলতে পারেনা ।একদিন বিকালবেলায় হঠাৎ অফিস থেকে ফোন আসে যে অভিষেক এক মিটিং চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাকে উডল্যান্ডসে ভর্তি করা হয়েছে ।অর্চনা যেন এখনই হাসপাতালে চলে আসে ।

অর্চনা উদ্ভ্রান্ত হয়ে আকাশ কে ফোন লাগায় ।আকাশ সেই সময় বিকালে কলেজ থেকে ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিল ।মায়ের ফোন পেয়ে সে সাথে সাথে হস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ে। মাকে বলে যে সে সোজা হাসপাতালে পৌঁছাবে আর মাও যেন দেরী না করে বাবার কাছে পৌঁছায় ।

অর্চনার চেনা পৃথিবীটা যেন ওলোট পালোট হয়ে যায় ।

নিউআলিপুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক ট্যাক্সি ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই উডল্যান্ডসে পৌঁছায় ।অভিষেক আই সি ইউ তে ছিল । দূর থেকে কাচের দেওয়ালের বাইরে থেকে সে তাকে দেখার সুযোগ পায় ।নিথর হয়ে শুয়ে আছে অভিষেক, নাকে মুখে অজস্র পাইপ ।দেখেই অর্চনার মেরুদণ্ড বেয়ে এক হিমস্রোত বয়ে যায় । ডিউটিতে থাকা ডাক্তারের থেকে জানতে পারে যে তার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে ।এখন অবজার্ভেশনে আছে ।বাহাত্তর ঘন্টার আগে কিছু বলা যাবেনা ।অর্চনার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চায় ।কিন্তু কোনোরকমে সে নিজেকে সামলায় ।

এরপর এতক্ষণে একটু সময় পেয়ে সে অন্তরার সঙ্গে যোগাযোগ করে।মেয়ে এতদূরে থাকে, চাকরী করে ।তাই তাকে অকারণে ব্যস্ত না করার জন্য শুধু বলে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, কিন্তু সেরিব্রাল অ্যাটাকের কথাটা প্রকাশ করেনা ।কিন্তু আজকালের মেয়ে, তাকে কি বোকা বানানো অতো সহজ ?

'মা, বাবাকে দেখাও ।'

'কেন, তুই দেখে কি করবি ?'

কিন্তু মেয়ে ছাড়ার পাত্রী নয।তার জোরাজুরিতে অর্চনা সেই কাচের দরজার মধ্যে দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বাবাকে দেখায় ।সেই

দৃশ্য দেখার পর মেয়ের জেরায় অর্চনা বলতে বাধ্য হয় যে তার বাবার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে ।মেয়ে বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে ।সে ফোনের অপর প্রান্তে কান্নায় ভেঙে পড়ে।এর মধ্যে আকাশ ও পৌঁছে যায় ।সে ছেলে ।নিজের আবেগ চেপে সে দিদিকে সামলানোর কাজে লেগে পড়ে ।

'আমি নেক্সট ফ্লাইটে ইন্ডিয়া আসছি ' অন্তরা বলে ।'না রে দিদি, তুই কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর ।আমি আর মা তো আছি । হয়তো বাবার সেরকম কিছুই হয়নি ।আমরা সামলে নেব ' অন্তরার চাকরীটাও নতুন ।সে কথা ভেবেও সে কতকটা নিমরাজী হয়ে ভাইয়ের কথা মেনে নেয় ।ভাই কথা দেয় যে দিনে অন্ততঃ তিন -চার বার দিদিকে বাবার খবর দেবে ।তারপর অর্চনা ও আকাশ বাড়ী ফিরে আসে ।

কিন্তু সেই দিনই রাত্রি দেড়টা নাগাদ এক ফোন আসে -

'অর্চনা ম্যাডাম বলছেন ?'

'হ্যাঁ বলছি '

আধা ঘুমের মধ্যে অর্চনার গলা কেঁপে উঠে।'আমি উডল্যান্ডসের রিসেপশন থেকে বলছি । আপনার পেশেন্টের কন্ডিশন ভীষণ ফ্লাকচুয়েট করছে ।ইমিডিয়েট এক অপারেশন করাতে হবে । সার্জন ডক্টর বাসু এসে গেছেন।এক্ষুণি বাড়ীর লোকজন এখানে দরকার, কাগজপত্রে সই করার জন্য '

'হ্যাঁ, এক্ষুণি আসছি '

অর্চনা জবাব দিল ।অর্চনার মনে হল গলার কাছে কি যেন একটা দলার মতো আটকে গেছে ।টেনশন হলে ওর এটা হয় ।বমি পাচ্ছিলো ।সে বেসিনে গিয়ে কোনোরকমে মুখে একটু জলের

ঝাপটা দিয়ে আকাশের রুমে ঢুকল ।আকাশ সারাদিনের এই সমস্ত দৌড়াদৌড়ির পর অকাতরে ঘুমাচ্ছিলো ।

'আকাশ', অর্চনা আলতো করে ওর কাঁধটা ধরে নাড়া দেয়। আকাশ একটু অস্ফুট আওয়াজ করে পাশ ফিরে শোয় ।অর্চনা আর কয়েকবার ওকে আলতো ঝাঁকুনি দেওয়াতে আকাশ ধড়ফড় করে উঠে বসে ।

'কি হয়েছে, মা ?'

'না, কিছুই হয়নি ।' অর্চনা বুকের ভেতরের তোলপাড়কে শান্ত রেখে বলে ।

'তাহলে ডাকলে কেন ?'

'না, মানে হসপিটাল থেকে একটা ফোন এসেছিল ।তোর বাবার একটা অপারেশন করাতে হবে, এক্ষুণি ।তাই আমাদেরকে যেতে হবে ।'

আকাশ বুদ্ধিমান ছেলে ।আর কোনো কথা না বাড়িয়ে মাকে তৈরী হতে বলে নিজেও তৈরী হওয়া শুরু করে ।তৈরী হতে হতে সে এক উবার বুক করে ।বাবার গাড়ীটা অফিস থেকে এক ড্রাইভার কে দিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল, কিন্তু এই মানসিক অবস্থায় সে গাড়ী চালাতে চায়না ।মা ও সে কথাই বলে ।উবার মিনিট পাঁচেকের ভিতর এসে যায় ।তারপর ওদের হাসপাতাল পৌঁছাতে আর দশ মিনিট লাগে ।

হাসপাতালে পৌঁছে ওরা দেখে যে অভিষেক কে ইতিমধ্যেই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।ওরা ভিতরে যাবার অনুমতি পায়না ।কেবল দরজার বাইরে থেকে লুকিং প্যানেল দিয়ে দেখতে পায় যে অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে ।ইতিমধ্যে

রিসেপশন থেকে কাগজপত্রে সই করার ডাক এসে যায় ।তারপর অপারেশন শুরু ।

আকাশ এবার বাবার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ।জানা যায় যে অভিষেকের ইন্টারনাল ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না ।সি টি স্ক্যানে ধরা পড়েছে। তাই এই অপারেশন, রক্ত বন্ধ করার জন্য । প্রায় আড়াই তিন ঘন্টা লাগবে ।ডক্টর বাসু কোলকাতার নামকরা নিউরোসার্জন ।তাঁকে সাহায্য করার জন্য এবং অন্য কোনোরকম পরিস্থিতি সামলানোর জন্য তাঁর সঙ্গে কার্ডিয়াক সার্জন ডক্টর ঘোষ ও আছেন ।অপারেশন শুরু যখন হয়, তখন বাজে রাত আড়াইটা ।

অর্চনা ভাবল বাবার এতবড় অপারেশন; মেয়েকে না জানালে বড় অন্যায় হয়ে যাবে ।ওর ওখানে এখন রাত এগারোটা বাজে । ফোন লাগাল ।

'হ্যাঁ মা, বাবা কেমন আছেন ?'

জামাই মণীশ ফোন ধরেছে, মণীশ সিং ।পাঞ্জাবী ছেলে , কিন্তু অন্তরা পুরো বাংলা শিখিয়ে দিয়েছে । উচ্চারণে অবাঙালী বোঝা যায়।এছাড়া নিখুঁত ।

'অন্তরা কোথায় মণীশ ?' মণীশের কথার উত্তর না দিয়ে অর্চনা জিজ্ঞেস করে ।

'ও একটু ওয়াশরুমে গেছে ।এখুনি এসে যাবে ।'

'মণীশ বেটা, অন্তরার বাবার ইমারজেন্সী ব্রেইন অপারেশন। আমরা হসপিটালে এসেছি ।অপারেশন চালু হয়ে গেছে । ইন্টারনাল্ হেমারেজ ।তোমাকে একটু অন্তরাকে সামলাতে হবে ।ও বাবার ব্যাপারে ভীষণ ইমোশনাল ।'

'মা আপনি কিচ্ছু ভাববেন না ।আমি আছি তো ।এই নিন, অন্তরা এসে গেছে '।

'হ্যালো, মা, বলো কি হয়েছে, এত রাত্রে ? বাবা কেমন আছে, বাবা কেমন আছে,' বলতে বলতেই কান্নায় ওর গলা ভারী হয়ে আসে ।অর্চনা তাকে সংক্ষেপে সবকথা বলে শান্ত থাকতে বলে আর বলে যে অপারেশন হয়ে গেলে পরে ওকে মেসেজ করে দেবে ।কথা আর বেশিক্ষণ হয়না ।ওরা একে অপরের থেকে বিদায় নেয় ।

এরপর শুরু হয় অর্চনা আর আকাশের অপেক্ষার পালা ।এক একটা মুহূর্ত অর্চনার কাছে যেন এক এক যুগের মত মনে হতে থাকে আর অর্চনার মন ফিরে চলে যায় বহুবছর আগে ফেলে আসা ওর আর অভিষেকের ডেটিং এর দিন গুলোতে ।

ওরা দুজনেই টালিগঞ্জের এক হাউজিং কমপ্লেক্সে থাকতো । সেখান থেকেই তাদের পরিচয়ের সূত্রপাত, তারপর দীর্ঘ প্রণয় পর্ব ও অবশেষে পরিণয় ।সেই সময়গুলো যেন স্বপ্নের মতো ছিল ।একসঙ্গে রাস্তার ধারে ঝালমুড়ি খাওয়া, সিনেমা দেখা সব মনে পড়ে যাচ্ছিল ।এই সব ভাবতে ভাবতে আবার সে চারদিকের কোলাহলে অতীত থেকে বর্তমানে ফেরত চলে আসে ।অর্চনার বুকের ভেতরে একটা ব্যথা করতে থাকে ।মাথাটাও যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে থাকে ।অপারেশন শুরুর পর প্রায় ঘন্টা দেড়েক কেটে গেছে ।ও টি'র বাইরের লাল আলোটা ওর চোখের সামনে যেন ক্রমশঃ বড় থেকে আরও বড় হতে থাকে।এরই মধ্যে ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে ওর কখন চোখ লেগে যায় খেয়াল নেই ।

অর্চনার ঘুম ভাঙল আকাশের ডাকে -

'মা, ওঠো, বাবার অপারেশন হয়ে গেছে '। অর্চনা চোখ খুলে তাকায় ।

'অ্যাঁ, হয়ে গেছে ?' সে তাড়াতাড়ি করে সোজা হয়ে বসে আকাশ দেখে, একই দিনে মায়ের বয়স যেন কুড়ি বছর বেড়ে গেছে ।

'কেমন হয়েছে অপারেশন ? কেমন আছে তোর বাবা ?'

'বাবার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত ডাক্তার কিছু বলতে পারবেনা '। অর্চনার হৃদপিণ্ডটা যেন হঠাৎ করে অতি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করে ।মাথা ব্যাথা যেটা অভিষেকের খবরটা শোনার পর থেকে চালু হয়েছিল, সেটা আবার পূর্ণ উদ্যমে ফেরত আসে ।

'মা, এখন বাড়ী চলো ।একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আসতে হবে তো '।

অর্চনা আকাশের হাতটা ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় ।আকাশ গাড়ী বুক করে দিয়েছিল ।পনেরো মিনিটের মধ্যে তারা বাড়ী ফিরে আসে ।ঘড়িতে তখন ছ'টা বেজে দশ ।গাড়িতে আসতে আসতে আকাশ দিদিকে সবকথা জানিয়ে একটা মেসেজ করে দেয় ।

অর্চনার ঘুম ভাঙল বাড়ীর কাজের মেয়ে গীতার ডাকে ।এই মেয়েটি বহুদিন ধরে এই বাড়ীতে কাজে আছে ।প্রত্যেক দিন সকালে আসে ডায়মন্ড হারবার থেকে ।বছর আঠাশ বয়স । বিবাহিতা ।ওর একটা ছোট্ট মেয়ে আছে দু'বছরের ।গীতা কখনও কখনও তাকে সাথে নিয়ে আসে ।অর্চনা তার সঙ্গে খেলতে খেলতে অন্তরার বাচ্চাকে নিয়ে খেলার স্বপ্ন দেখা শুরু করে দেয় ।

গীতা সারাদিনের কাজকর্ম, রান্না-বান্নায় অর্চনাকে সাহায্য করে সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ী ফিরে যায় ।

'দিদি, চা নাও ।বারোটা বেজে গেছে ।আমি রান্না করে রেখেছি । তুমি চা খেয়ে, চান করে, দু'মুঠো খেয়ে নাও ।আবার তিনটের সময় দাদাকে দেখতে যেতে হবে তো '। অর্চনা ধীরে ধীরে উঠে চা খাওয়া শুরু করে ।এর মধ্যে অন্তরার ফোন আসে ।ভিডিওতে ওকে দেখে মনে হয় সেও বোধহয় সারারাত ঘুমায়নি ।অর্চনা সবকথা জানায়।

মা, আমি একটু বাবাকে দেখতে আসতে চাই'।

'তুই তাড়াহুড়ো করিস না ।বাবা হাসপাতাল থেকে বাড়ী চলে আসুক ।তারপর না হয় তুই সবদিক সামলে তবে আসিস'। 'ঠিক আছে '। অন্তরা শেষমেশ তাতেই রাজী হয়।

দুপুর তিনটে থেকে ভিজিটিং আওয়ারস ।অর্চনা ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে যায় ।আকাশ এইবার বাবার গাড়ীতেই মাকে নিয়ে আসে ।কিন্তু ওরা ওখানে পৌঁছে জানতে পারে যে তখনও অভিষেকের জ্ঞান ফেরেনি ।শুনেই অর্চনার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠে ।এটাতো কোনো ভালো লক্ষণ নয় । ডিউটিতে যে ডাক্তার ছিলেন তার সাহায্যে অর্চনা ডক্টর বাসুর সঙ্গে যোগাযোগ করাতে ভয়ানক পরিস্থিতিটা সামনে আসে । ডক্টর জানান অভিষেকের কোমায় চলে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। ডক্টর বাসু প্রথমে এই কথাটা জানাতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু যখন জানতে পারেন যে সঙ্গে নিকট আত্মীয় বা বয়স্ক আর কেউ নেই, তখন তিনি বলতে বাধ্য হন ।অর্চনা আকাশকে জানাতে সে

বাকরুদ্ধ হয়ে যায় ।মা বারণ করে যে সে সঙ্গে সঙ্গে দিদিকে যেন কথাটা না জানায় ।

অর্চনা এমনিতে খুব শক্ত মানসিকতার মেয়ে ।মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ।বাবা-মা আর এক ভাই নিয়ে পরিবার ছিল ।বাবা অনেক কম বয়সে গত হওয়ায় তাকে বেশ সংঘর্ষ করেই বড় হতে হয়েছিল।তাই সে অল্পতে ভেঙে পড়ার মত চরিত্র ছিলনা ।কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় সে দিশাহারা বোধ করছিলো ।এটা হঠাৎ করে তার জীবনে কি হয়ে গেল ? সবই তো ঠিক চলছিল । কোনো সমস্যা ছিলনা জীবনে ।কিন্তু এখন সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না ।একার চাকরী হলেও মেধাবী আই টি ইঞ্জিনিয়ার অভিষেক নিজের কৃতিত্বে বেশ তরিৎ গতিতেই নিজের কর্মজীবন এগিয়ে চলেছিল ।তাই অর্চনাদের আর্থিক কোনো সমস্যাই ছিলনা ।বর্তমানে অভিষেকের মেডিক্যাল খরচাও কোম্পানির গ্রুপ ইনশিওরেন্স থেকে পুরোপুরি বহন করবে ।তাই সেই ব্যাপারেও কোনো চিন্তা ছিলনা ।কিন্তু অভিষেকের এই ঘটনার জন্য তার কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিলনা ।

'মা, চলো, বাড়ী যেতে হবে তো ' আকাশ ডাকল ।অর্চনা হসপিটালের ওয়েটিং রুমে বসে কতকিছু ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছিল ।আকাশের ডাকে সম্বিত ফিরল।'হ্যাঁ বাবা, চল '

এরপর শুরু হল রোজকার রুটিন, বাড়ী আর হসপিটাল, আর হসপিটাল আর বাড়ী ।আকাশের সামনে পরীক্ষা ছিল ।তাই অর্চনা তাকে জোর করল যে হস্টেলে ফিরে গিয়ে সে পরীক্ষার

প্রস্তুতি নিক, নাহলে একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে ।বাস্তবিক যে বাবার জন্য তার প্রকৃতপক্ষে কিছুই করার ছিলনা ।

এই ভাবে প্রায় দেড় মাস কেটে গেল, কিন্তু অভিষেকের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই, উন্নতি নেই, অবনতিও নেই ।অর্চনা জীবনের এই টানা পোড়েনে পঁয়তাল্লিশের সুন্দরী থেকে এই কদিনেই যেন এক বৃদ্ধায় পরিণত হল ।এর মধ্যে অন্তরাও দু'সপ্তাহের জন্য একবার এসে বাবাকে দেখে কান্না ভরা চোখে বিদায় নিল ।

আকাশ হস্টেলে ।অর্চনা পুরো বাড়ীতে একদম একা ।গীতা প্রতিদিন সকালে আসে আর সন্ধ্যায় ফেরত যায় ।সেই এখন অর্চনার একমাত্র সাথী আর কথা বলার লোক।প্রতিদিন বিকেলে এক ঘন্টার জন্য সে হাসপাতালে যায় অভিষেক কে দেখতে । নিথর অভিষেক কে হসপিটাল বেডে দেখে তার মনটা যেন ফাঁকা আর অসাড় হয়ে যায় ।প্রথম এক'দু সপ্তাহ কিছু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন হসপিটালে আসতো দেখা করতে ।এখন আর কেউ আসেনা ।অর্চনা পাথরের মূর্তির মতো অভিষেকের বিছানার পাশে এক ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ী ফিরে আসে ।রাতে একা একা বিছানায় শুয়ে ভাবে ভগবান কেন তাকে ও অভিষেক কে এই বয়সে এই শাস্তি দিল ? অ্যাটাক হবার এক সপ্তাহ আগেই অভিষেকের উনপঞ্চাশতম জন্মদিন কত হইচই করে পালন হলো ।গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে এসে তার বালিশ ভিজিয়ে দেয় ।তারপরে ক্লান্ত হয়ে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ে জানতেও পারেনা ।

দিন আসে দিন যায় ।এই অর্চনা, যে আগে ফুরফুরে মন নিয়ে প্রতি দিন কে স্বাগত জানাতো আর ঘর- সংসারের কাজ করতে করতে দিন কখন কেটে যেত বুঝতেই পারতো না, আর সন্ধ্যাবেলায় অভিষেকের আসার জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করতো, তার কাছে এখন প্রতিটা দিন এক বিরাট জগদ্দল পাথরের মতো মনে হয় ।সময় যেন আর কাটতে চায়না ।এরই মধ্যে সে একদিন বিকালে হাসপাতালে গিয়ে অভিষেকের পাশে বসে আছে, এমন সময় নার্স এল - 'ডক্টর বাসু আপনাকে ডাকছেন '।

অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে মন্থর গতিতে নার্সকে অনুসরণ করে।

'আসুন,' ডক্টর বাসু অর্চনাকে ভেতরে ডাকলেন ।

অর্চনা ডাক্তারের সামনের চেয়ারে বসল ।

'আপনার সঙ্গে কি আর কেউ আছে ? থাকলে আনতে পারেন '।

ডক্টরের কথার মধ্যে এমন এক ইঙ্গিত ছিল, যাতে অর্চনার মন এক অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠে।

'না, ডক্টর, আমি একাই এসেছি ।আপনি বলতে পারেন'।

'দেখুন, আমরা মেডিক্যাল সাইন্সের পক্ষ থেকে তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখিনি, যাতে পেশেন্ট আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায় ।কিন্তু সবকিছু তো ডাক্তারদের হাতে থাকেনা ।অভিষেক বাবুর ভাইট্যাল প্যারামিটারস সব স্বাভাবিক আছে।কিন্তু ওঁর কোমা থেকে ফিরে আসার কোনো গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছিনা ।উনি এইভাবে কতদিন থাকবেন তাও বলা সম্ভব নয় '।

ডাক্তার একটানা কথা বলার পর কিছুক্ষণের জন্য থামলেন ।

অর্চনা যেন আর নিতে পারছিল না ।ডাক্তারের সামনেই ওর চোখের থেকে অঝোরে জলের ধারা নেমে আসছিলো ।ডাক্তার আবার শুরু করলেন - 'এই কারণে আপনাকে এই সাজেশন দিচ্ছি যে ওঁকে আপনি বাড়ী নিয়ে যান ।বাড়ীতে একটা হোম আ সি ইউ সেট আপ করে দুটো শিফ্ট এ নার্স রেখে নেবেন । আপনার হসপিটালের ওয়ান থার্ড খরচায় মাস চলে যাবে । আপনি ও সবসময় চোখের সামনে নিজের লোককে দেখতে পাবেন ।'

অর্চনা কথা বাড়াল না ।চোখের জল মুছে নিজেকে কোনোরকমে সামলে ধরা ধরা গলায় বলল -

'ঠিক আছে ডাক্তার বাবু ।আপনাদের সাহায্যে হোম আই সি ইউ টা সেট আপ করেই ওকে নিয়ে যাচ্ছি' এই বলে উঠে দাঁড়াল । বাড়ী ফিরে অর্চনা ফোন করে আকাশ আর অন্তরাকে সব জানাল ।বাচ্চারাও যেন এই এক দু মাসে কত বড় আর ম্যাচিওর হয়ে গেছে ।দু'জনের কেউই আর বিশেষ কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলনা ।কেবল অর্চনা ফোনের ওপারে অন্তরার ফোঁপানির আওয়াজ পেল ।আর আকাশ গম্ভীর গলায় বলল 'মা, আমি কাল সকালে আসছি বাবাকে বাড়ীতে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করার জন্য ।'

সপ্তাহ খানেক দৌড়াদৌড়ি করে আর অনেক টাকা পয়সা খরচা করে অবশেষে হোম আই সি ইউ টা সেট আপ করা হল। হসপিটালের সোর্সে দু'জন নার্সেরও বন্দোবস্ত হয়ে গেল।তার দু'দিনের মাথায় অভিষেক বাড়ী ফিরল ।আর আকাশ হস্টেলে ফেরত চলে গেল ।

এই কি জীবন ? কি অর্থ এই জীবনের ? জীবনের অনিশ্চয়তার এর চাইতে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে ? অর্চনার চিন্তার স্রোত অবিরাম বইতে থাকে ।কিন্তু জীবন তো কাটাতেই হবে । সাথে সাথে অভিষেকের কথা ভেবেও তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হতে থাকে ।অত প্রাণচঞ্চল মানুষটা আজ কেবল একটা শরীর হয়ে তার সামনে পড়ে আছে !

পরের দিনটা একটু অন্যরকম হল ।সেইদিন বিকেলে অভিষেকের কিছু বন্ধুবান্ধব বাড়ীতে এল ।এরা সেই বন্ধু যারা এর আগেও বহুবার এই বাড়ীতে এসেছে, ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প-গুজব, হইহল্লা করেছে ।এখন যদিও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য, তাও এদের সঙ্গে কথা বলে অর্চনার আজ অনেকটাই মনটা ভাল লাগল ।

রাত্রে অন্তরার ফোন এল ।

'মা, বাবা কেমন ....মা তুমি কেমন আছো ?' অর্চনা মেয়ের দ্বিধা, হতাশা সবই ওই একটা প্রশ্নের মধ্যে বুঝতে পারল ।

'তোর বাবা একই রকম ।আর আমি আছি, চলছে ।আজ তোর বাবার বন্ধুরা, তোর অসিত, শ্যামল আর দিলীপ আঙ্কেলরা এসেছিল ।ওদের সঙ্গে কথা বলে মনটা একটু হাল্কা লাগছে '।

'মা, আমি তো তোমাকে এখানে আসতে বলতে পারছি না, কেননা তোমাকে বাবার কাছে থাকতে হবে তাই ।এখানে একবার ঘুরে যেতে পারলে অবশ্য তোমার ভালো লাগতো '।

মেয়ে মায়ের একাকীত্ব বুঝেই কথাটা বলেছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গটা আবার অর্চনাকে মনে করিয়ে দিল যে আজ থেকে কয়েকটা মাস

আগেই অভিষেক আর অর্চনা অন্তরার কাছে যাবার প্ল্যান করছিলো ।কোথায় গেল সে সব প্ল্যান !

পরের দিনই অসিত আবার এল ।অসিত অভিষেকের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ।ছোটবেলার থেকেই দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে । একই স্কুলে পড়াশোনা ।তবে মাধ্যমিকের পর থেকে দু'জনের রাস্তা আলাদা হয়ে যায় ।অভিষেক সাইন্স পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চলে যায় আর অসিত নেয় কমার্স ।তবে এতে দুজনের বন্ধুত্বে কোনো ছেদ পড়েনি ।অসিত তারপরে গ্র্যাজুয়েশন করে ব্যাংকের প্রোবেশনারী অফিসারের পরীক্ষা দিয়ে ব্যাংক অব বরোদা তে জয়েন করে।এখন সে তাদের রিজিওনাল অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ক্রেডিট ।

অসিত অকৃতদার ।সংসার বলতে একমাত্র বিধবা মা ।তাঁর সঙ্গে সে সল্ট লেকে থাকে ।খুব হাসিখুশী আর ভাল মনের ছেলে । আর ভাল মনের ছেলে বলেই বোধহয় কলেজে পড়াকালীন এক বান্ধবীর কাছে দাগা খেয়ে মেয়ে জাতির উপরই তার বিশ্বাস উঠে যায় আর সে সারা জীবন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় ।ওর মা অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারেন নি ।কিন্তু অভিষেকের সঙ্গে অতি গভীর বন্ধুত্ব আর অভিষেকের বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াতের কারণ অভিষেকের পুরো পরিবারের সঙ্গেই তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ।

'অসিতদা আসুন ।' অর্চনা অসিত কে অভ্যর্থনা জানায় ।

'হ্যাঁ, অর্চনা, অভিষেক কে দেখতে আর তোমার হাতের চা খেতে চলে এলাম ।'

'খুব ভাল করেছেন ।আপনার বন্ধুকে দেখা হয়ে যাবে, আর আমারও একটু সময় কেটে যাবে '।

গল্প করতে করতে দুজনের সময় কখন কেটে যায় বুঝতেও পারেনা ।সবই সেই কিছুদিন আগেই হারিয়ে যাওয়া সুখের দিনের গল্প যখন সবকিছু স্বপ্নের মতো ছিল ।অভিষেক, তার পরিবার, তার বন্ধু ও তাদের পরিবারেরা একসঙ্গে কতো জায়গায় ঘুরতে গেছে ।একবার এইরকম বেড়াতে গিয়ে অর্চনা এক নদীর পারে সেল্ফি তুলতে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায় । সে সাঁতার জানত না । অসিত কাছেই ছিল ।সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্চনাকে জলের থেকে তোলে ।অসিত তো সেদিন পুরো হিরো হয়ে গিয়েছিল ।অর্চনার চোখ হঠাৎ ঘড়ির দিকে যায় -

'ও মা ! রাত ন'টা বেজে গেছে ! অসিতদা, আজ এখানেই দু'মুঠো খেয়ে যান ।বিশেষ কিছুই না, শুধু মাছের ঝোল আর ভাত '।

'না, অর্চনা ।মা আমার জন্য না খেয়ে বসে থাকবে ।অন্য একদিন না হয় ....' অসিত বেরিয়ে পড়ে।

'ঠিক আছে অসিত দা, গুডনাইট ।আবার সময় পেলে আসবেন '। অর্চনার মনটা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে যায় ।মনে হয় একজন নিজের কেউ যেন ছেড়ে চলে গেল ।সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে হোম আই সি ইউ তে শুয়ে থাকা অভিষেকের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠে আর ওর নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয় ।

দিন আসে, দিন যায় ।কিন্তু অর্চনার পুরো জীবনটাই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে মনে হয় ।এরই মধ্যে অসিতের যাতায়াত চালু

থাকে ।তার এই বদ্ধ জীবনে অসিতের আসাটাই যেন জানলার ফাঁক দিয়ে আসা এক চিলতে রোদ্দুর ।অসিতেরও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই অর্চনার সঙ্গে ধীরে ধীরে এক মানসিক বন্ধন গড়ে ওঠে । কিন্তু সমাজকে তারা এ কথা কি করে বলবে ? সবচেয়ে বড় কথা অর্চনার নিজের ছেলে মেয়ে মা কে কি দৃষ্টিতে দেখবে ?

দেখতে দেখতে একবছর কেটে যায় ।এর মধ্যে আকাশ পাশ করে লার্সেন এন্ড টুব্রোতে চাকরী পেয়ে বেঙ্গালুরুতে চলে যায়। অভিষেকের অবস্থা আশ্চর্য্যজনক ভাবে একই রকম থাকে । উন্নতি না হলেও কোনও অবনতিও নেই ।অর্চনা এদিকে ভেতরে ভেতরে মনের দোটানায় শুকিয়ে যেতে থাকে ।এখনও সে এবং অসিত শুধুই বন্ধু, তার বেশী কিছু নয় ।তাদের দু'জনেরই শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কার এর আগে তাদের এগোতে দেয়নি, কিন্তু তারা এক একটি দিনের সাথে সাথে আরও বেশী হতাশার শিকার হতে থাকে ।

এদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতার কথা তো চাপা থাকার কথা নয়, চাপা থাকেও না ।কিন্তু সমাজের তো কোনো হৃদয় হয়না । একদিন অভিষেকের দিদি জামাইবাবু অভিষেক কে দেখতে আসে । অর্চনা সাদরে তাদের ভিতরে নিয়ে আসে ।অসিত সেই সময়ে অভিষেকের বিছানার পাশে বসেছিল ।অভিষেকের দিদি আহানার এই ঘটনার সম্পর্কে ভালোমতো জানা ছিল, কিন্তু সে কখনো অসিত কে এর আগে চাক্ষুষ দেখেনি ।

'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না ' আহানা বলে উঠে ।

'নমস্কার, আমি অভিষেকের বন্ধু, অসিত, অসিত মিত্র ।আপনারা নিশ্চয়ই অভিষেকের দিদি জামাইবাবু ?'

'হ্যাঁ,' ছোট্ট উত্তর আহানার ।তারপর আবার প্রশ্ন,

'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'সল্ট লেক '

'আপনার মিসেস কে দেখলাম না ?' এই প্রশ্নটা সম্পূর্ণ জেনে শুনে করা, কেননা আহানার এর আগেই সুমিতা, মানে অর্চনার ভাইয়ের বউয়ের থেকে অতিরঞ্জিত বর্ণনা শুনে এবং রাত আটটায় অর্চনার বাড়ীতে এক পুরুষের উপস্থিতিতে পুরুষটি কে বুঝে নিতে মনে মনে দুই দুইয়ে চার করতে সময় লাগেনি ।

'থাকলে তো মিসেস কে দেখবেন ' এক সরল হেসে অসিত উত্তর দেয় ।কিন্তু সামাজিক সংস্কারের ধারক ও বাহকদের থেকে কি রেহাই আছে ?

'ও মা, আপনি এখনও বিয়ে করেন নি ?' এরপরে কেন করেননি, এই প্রশ্নটাও আহানার মুখে এসেই গেছিল, কিন্তু নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে নিজেকে সামলালো ।অসিত শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে ।সে এরপরে ওখানে থাকা সমীচীন বোধ করলনা ।আহানার প্রশ্নটাকে কতকটা অগ্রাহ্য করেই সে রান্নাঘরে থাকা অর্চনার উদ্দেশ্যে বলল -

'অর্চনা, আমি আসছি, অনেক রাত হয়ে গেছে '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে আবার নিউআলিপুর থেকে সল্ট লেক পৌঁছাতে হবে ' অর্চনা কিছু বলার আগেই আহানা অযাচিত ভাবে বলে উঠল ।

অর্চনা চা বানাচ্ছিল; এইসব শুনে সে তড়িঘড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে অসিতকে বিদায় জানাল ।আহানার উপর রাগে ও ক্ষোভে তার মাথা গসগস করছিল, কিন্তু সে তা প্রকাশ না করে চুপচাপ রান্নাঘরে ঢুকে গেল ।

সেই রাত্রে অর্চনা বিছানায় শুয়ে আবার অঝোরে কাঁদতে থাকে । এত অসহায় তার মতো শক্ত মনের মেয়ে বোধহয় কোনোদিন বোধ করেনি ।বিশেষ করে আজকের ঘটনার পর। কিন্তু অসহায় হয়ে হাল ছেড়ে দেবার মতো চরিত্র তার নয়।তাই মনে মনে নিজের ভবিষ্যত ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে ।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলে অর্চনার আজ বহুদিন পরে মনটা যেন ঝরঝরে লাগে ।বহুদিন পরে জানলা দিয়ে আসা সকালের রোদ্দুরটা কে আগের মতোই মিষ্টি লাগে ।তারপর রান্নাবান্না সেরে অন্তরাকে ফোন লাগায়

-'হ্যাঁ মা বলো, কেমন আছো ?' আজ অনেক মাস ধরে অন্তরা বাবা কেমন আছে আর জিজ্ঞেস করেনা ।

'হ্যাঁ রে, আমি ভাল আছি ।তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা বলার জন্যই ফোনটা করছি ।তোরা এমনি সব ভাল আছিস তো ?'

'হ্যাঁ মা, আমি আর মণীশ দু'জনেই ভাল আছি ।কিচ্ছু চিন্তা কোরোনা ।বলো ।'

'তুই আর আকাশ তো জানিস যে যখন থেকে তোর বাবার শরীর খারাপ হয়েছে, তোর বাবার বন্ধুরা তোর বাবাকে দেখতে আসে । বিশেষ করে তোদের অসিত আঙ্কেল তো খুবই আসে ও এখনও আসছে ।

সমাজে ও বৃহত্তর পরিবারে কথা, বিশেষ করে তথাকথিত কুৎসা ও রটনা বিদ্যুত গতিতে ছড়ায় ।এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । অন্তরা নেদারল্যান্ডসে থাকলে কি হবে, তার সুমিতা মামী, যে কালেভদ্রে ফোন করে, সে এই অসিতের ঘটনা জানাজানি হবার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে তাকে ফোন করা ও রঙ চড়িয়ে খবর দেওয়া চালু করে ।কিন্তু অন্তরা এ যুগের উচ্চশিক্ষিতা ।সে মা কে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে ও মা'র উপর তার ভরসা আছে ।সে জানে মা তাকে ও আকাশ কে লুকিয়ে কিছু কাজ করবেনা ।তাই সে এইটা বুঝতে পেরেছিল যে অসিত আঙ্কেল নিশ্চয়ই মা কে সঙ্গ দেবার জন্য আসে এবং তাতে আর কোনো অর্থ নেই ।আর যদিও বা হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে, মা নিশ্চয়ই মেয়েকে সে কথা জানাবে ।তার মার উপর এত বিশ্বাস । আর পরে হলো ঠিক তাই ।এই কারণে এক'দু সপ্তাহ মামীর ফোন আসার পর অন্তরা মামীকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল যে তার নিজের মায়ের ব্যাপারে তার অন্যের থেকে খবর নেবার দরকার নেই । সে দরকার হলে সোজাসুজি মায়ের থেকেই জেনে নেবে ।এরপর থেকে মামী আর ফোন করে বিরক্ত করেনি ।তাই অন্তরা মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল -

'হ্যাঁ মা, আমি তো জানি অসিত আঙ্কেল আসে ।তুমি বলো কি বলছো ।'

এরপর অর্চনা বিবাহিতা মেয়েকে সমস্ত কথা জানায় ।এ কথা বলে যে এ পর্যন্ত তার এবং অসিতের সম্পর্ক বন্ধুর মতোই আছে ।সাথে সাথে এও জানায় যে আজ এক বছরের উপর তার বাবার এই অবস্থা ।তার পরিণতি কোথায় ডাক্তারেরাও জানেনা ।

অভিষেকের পরিবার, তার নিজের ভাইয়ের বউ সারা দুনিয়ায় কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে ।তা ছাড়া এক পুরুষ ও স্ত্রী এইরকম অবস্থায় কতদিন বন্ধুর মতো থাকতে পারে ? 'তুই ই বল অন্তরা, আমি এখন কি করি ?' অর্চনা শেষে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে । অন্তরা মায়ের সমস্ত কথা মন দিয়ে শোনে ।তার চোখের জল নীরবে গড়িয়ে চলে ।ভিডিওটা কে অফ করে রাখে যাতে সে কাঁদছে মা দেখতে না পায় ।তার বাবার জন্য ভীষণ কষ্ট হয়, আর মার জন্য আরও বেশী, কেন না বাবা তো কিছু জানতেই পারছে না, কিন্তু মা তো বেঁচে থেকেও প্রতি মুহূর্তে নরক যন্ত্রনা ভোগ করে চলেছে ।তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার মা-বাবা আর ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো সেই সোনা ঝরা দিনগুলি ।চোখের জলের ধারা তার আরও প্রবল হয়ে যায় ।নিজের আবেগ অতি কষ্টে সামলে গলার স্বর কে যথাসাধ্য স্বাভাবিক রেখে বলে 'মা, আমি মণীশের সঙ্গে এবং আকাশের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে আবার ফোন করবো ।তোমাকে আমাদের এই নিকট পরিবারের বাইরে কারো কোনো কথায় কান দেবার কোনো প্রয়োজন নেই ।' অর্চনার মনে হয় বুকের থেকে এক বিরাট বোঝ যেন নেমে গেল ।ওরা ফোন ছেড়ে দিল ।

এরপর অন্তরা কয়েকদিন ধরে দফায় দফায় মণীশকে সাথে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে কনফারেন্স কল করে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল ।তাদের কারোর তরফ থেকেই তাদের মায়ের এই অসিত আঙ্কেলের সঙ্গে সম্পর্ক টাকে কে এক পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্ক হিসাবে মেনে নিতে কোনো মতানৈক্য হলো না ।বর্তমান যুগের ভাষায় লিভ-ইন ।তার কারণ অন্য কোনা রাস্তা খোলা

নেই ।অবশ্য এতে অসিত আঙ্কেল একমত কিনা সেটা জানা জরুরী।

মেডিক্যাল রেকর্ডে আছে মানুষ উনিশ বছর পরেও কোমা থেকে ফেরত এসেছে ।তাই তাদের বাবার লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা কখনোই নেবে না ।অন্য দিকে যদি খুবই আধুনিক মতাদর্শে অর্চনাকে ডিভোর্স নিয়ে অসিত কে নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের কথা ভাবা হয়, তা আইনানুগ নয় কেন না ডিভোর্স পাবার যে সমস্ত গ্রাউন্ড আছে, তাতে কোমা পড়েনা । মণীশের ইন্ডিয়ার এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করেই তারা এ কথা জানতে পারে ।

এই সমস্ত আলোচনা করে অন্তরা দু'দিন পরে মা কে ফোন লাগাল -

'মা, কেমন আছো ? অসিত আঙ্কেল কেমন আছে ?'

'হ্যাঁ মা, আমরা ভালো আছি ৷ অর্চনা উত্তর দিল ।অন্তরা লক্ষ্য করল যে এই প্রথম মা অসিত আঙ্কেল কে নিয়ে 'আমরা বলল । ওর ভাল লাগল ।

'মা শোনো, আমি মণীশ এবং ভাই দু'জনের সঙ্গেই সব আলোচনা করেছি ।আমরা উকিলের পরামর্শও নিয়েছি।তুমি এবং অসিত আঙ্কেল নির্দ্বিধায় লিভ-ইন করো ।এতে আমাদের কারোর কোনো আপত্তি নেই ।তুমি আমাদের মা আছো, মা ই থাকবে ।আর তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ছাড়া অন্য কোনও আইনি রাস্তাও নেই ।বাবার যদি কোনো চমৎকারে জ্ঞান ফিরে আসেতখন কি হবে সে তখন দেখা যাবে ।কিন্তু এই লিভ-ইনে অসিত আঙ্কেলের সম্মতি আছে তো ?’

অর্চনার নারীসত্বা আজ যেন বহুদিন পর পূর্ণ শ্বাস নিল ।কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করে সে কেবল বলল ' আমি অসিতের সঙ্গে কথা বলে তোদের জানাবো ৷

অর্চনা সাথে সাথে অসিত কে সব জানাল ।অসিত জানতো এ ছাড়া কোনও রাস্তা নেই ।তাই সে সাথে সাথেই সম্মতি দিয়ে দিল ।অসিত তার মাকে আগেই এ কথা জানিয়ে রেখেছিল । অর্চনা অন্তরাকে সব জানিয়ে দিল ।অন্তরা মণীশ এবং আকাশকে নিয়ে কনফারেন্স কলে একসঙ্গে মা কে উইশ করলো - "হ্যাপি লিভ- ইন মা" ।অন্তরা এই দায়িত্বটা নিল সবাইকে এই সুখবর দেবার

এর পর থেকে আহানারা ও সুমিতারা আর এই বাড়ীতে আসেনি ।

....



সিভিল। বন্ধুদের কাছে শেখর, কুয়েতে, শাপুরজীতে এক হাসপাতাল বানাচ্ছে। অর্ধাঙ্গিনী মধুমিতা, কন্যাদ্বয় শর্মিলা আর সুনয়না । শর্মিলা বিবাহান্তে স্বামী সাগরের সঙ্গে সানফ্রানসিসকোতে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স করে ওয়লমার্টে চাকুরিরতা, সাগর টেসলায় । মধুমিতা ও সুনয়না মুম্বই বাসী । সঙ্গে মধুমিতার মা । মধুমিতা ঘর সামলায়, সুনয়না মেডিক্যাল পড়ার স্বপ্ন দেখে ।



আবোল তাবোল হাবিজাবি হিজিবিজি।

ভীম চন্দ্র সাধুখাঁ

দীপক, আমার স্কুলের বন্ধু, ওর বাড়িটা ছিল, আমাদের থেকে তিন বা চার মিনিট দূরে ।

অনেকদিনই ওর সঙ্গে দেখা করতে বা গল্প করতে বিকালের দিকে যেতাম। ওর দাদা, প্রদীপদা কে দেখতাম ঘরের মধ্যে কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে, রোজই প্রায়, বেশ গুরুগম্ভীর

আলোচনা করছে। একদিন দীপক কে জিজ্ঞাসা করলাম, কী কথা বলে ওরা এত; জানার খুব ইচ্ছা হয়।

একদিন প্রদীপদা ঘরে ঢুকলো আর ডাকলো।নানারকম কথা থেকে শুরু, আলোচনা রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে ঘুরে গেল।তখন আমি এই সমস্ত ব্যাপারে খুব একটা জানা ছিল না।সেদিনকে মিনিট কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট কথা হল এরপরে মাঝে মাঝে আমাদেরকে ধরত এবং রাজনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা বলত।

কিছুদিন পর একদিন বলল চল চুঁচুড়া যায় যাই ওখানে নিশীথদার সঙ্গে দেখা করব। নানা রকম কথাবার্তা পর, নিশীথদা আমাদেরকে বলল, বন্দীমুক্তি এবং গণদাবি নিয়ে পোস্টার লাগাতে হবে এবং সেটা করতে হবে খুব সকালবেলায়, সেই শুরু , নিশীথদা বামফ্রন্ট আমলেও জেল খেটেছে, শেষ জীবনে প্রায় একা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হার মানেনি।

তপন, আমাদের পাড়ার ছেলে ও খুব ভালোবাসতো গান বাজনা । ওর ইচ্ছা ছিল ব্যান্ড শুরু করবে এবং সেটা চালাবে । অনেক কসরত করে ও খুব একটা কিছু করতে পারেনি| এখন ও প্রায় বদ্ধ পাগল; জ্যোতি সিনেমা হলের পাশে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটায়।ওর চেহারা ছিল রাজকুমারের মত, এখন কঙ্কালসার।

১৯৭১ সালে, চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলের কয়েকজন ছেলে, স্কুলে বোমা মেরে বিল্ডিং এর একটা অংশ উড়িয়ে দেয়। আমাদের লাইব্রেরীটা ল্যাবরেটরি শেষ হয়ে যায়।স্কুলে একটা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ছিল তার মাথাটা ভেঙ্গে নিয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দেয়।বিপ্লব শুরু হয়ে গেল ।

স্বরাজ দা ছিল স্কুল ভাঙার নেতা।এরাই আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেবতী বাবুকে ধমক দিয়েছিল এবং বলেছিল উনি কিছুই জানেন না এবং দেখেননি। ওনার বাড়িতে একটা সাদা থান পাঠিয়েছিল জন্য ওনার স্ত্রীর জন্য|

অনেক পরে, স্বরাজ দা মহাডাঙ্গা কলোনিতে সুভাষ বিদ্যালয় জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছিল।স্কুল ভাঙার নেতা স্কুল তৈরি করেছেন চাঁদা তুলে।এলাকার নেতা হয়েছেন এবং অনেক মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন, উপকার করেছেন।তবে এনাদের সঙ্গে রামবাবুর বেশ ঝগড়া।তেমাথায় একজন পড়ল তো হাসপাতাল মোড়ে রামবাবুর একজন গেল উপরে।

অনুরূপ ভৌমিক, কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের ছেলে আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়তো, ও এখন সাংবাদিক হয়েছে, কিছুদিন আগে ফোনে কথা হচ্ছিল বলল ও নাকি অনেকের হয়ে কবিতা গল্প ইত্যাদি লিখে দেয়।কি নেশা করেনি , সব রকম নেশা করেছে -- শুকনো, পানীয়, ধোঁয়া।

শুভময় আমাদের ব্যাচের ছেলে কিন্তু বি কলেজে যাবার আগে ওর সঙ্গে কোনোদিনও পরিচয় হয়নি কিন্তু ওর মামা অসীম বাবু ছিলেন আমাদের স্কুলের শিক্ষক।

শুভময় এর তুতো-দাদা, সঞ্জয় দা আমাদের থেকে দু বছরের বড়, আমাদের কলেজেই ভর্তি হয়েছিল কিন্তু কোন এক অসুস্থতার কারণে পড়াশুনো শেষ করেনি।কিন্তু আমাদের কলেজে মাঝেমাঝেই আসত, সেখানে আমার সঙ্গে পরিচয়।খুব ভালো লাগতো।অনেক পরে জানতে পারি সঞ্জয় দা আত্মহত্যা করেছে, খুব কষ্ট পেয়েছিলাম শুনে।

প্রথম বন্ধু বিয়োগ হয়েছিল কুণালের থেকে। কুনাল খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিল মারণ রোগে। শুনেছিলাম ওর সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সে নাকি জোর করে ডিভোর্স পেপারে সাইন করে নিয়েছিল ওর মারা যাবার আগে ওর মৃত্যুশয্যায়।কুণালের বাবা-মা সৌমিত্রর সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ রেখেছিলেন। খুব কষ্ট লাগে কুণালের মত একটা তরতাজা ছেলে আমাদের ছেড়ে কত কম বয়সে চলে গেল।

এই কয়েকদিন আগে শৈবাল আর এক মারণ রোগ চলে গেল। এটাও খুব কষ্টের।

আমি আর শৈবাল একসঙ্গে, ই আই এলে চাকুরী করতাম। সুশীল আর দেবু ভৌমিক আমাদের সঙ্গেই ছিল।শৈবাল আমাদের সঙ্গে চাকরির সময় খুবই অখুশি ছিল, পরে সি ই এস এ জয়েন করার পর খুব খুশি ছিল। ক্লাসের প্রথম বা দ্বিতীয় আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল আর গেল শ্যাম, ইন্দ্রজিৎ --আর কত প্রিয়জনকে হারাবো ।

স্বপন আমার রুমমেট ছিল, যখন অনুগুলে ছিলাম তখন দেখা হয়েছিল তারপর কোথায় জানি না। কখনো দেখা হয়নি বা কথা হয়নি জানিনা কোথায়।

২০১২ ডিসেম্বরে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যোগাযোগ হয়েছিল।

হোয়াটসঅ্যাপের দৌলতে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়; খাই-খিচুড়ি হয়। হাই হ্যালো হয় কিন্তু ভালো লাগে।যাই হোক ঝগড়া না হলে বন্ধুত্ব থাকে না।

বেশ কেটে যাচ্ছে সময়, মাঝে মাঝে খায়রুলের সঙ্গে কথা হয়,দেবাশীষ তপাদারের সঙ্গে কথা হয় সৌমিত্র মাঝে মাঝে এখানে আসে, দেখা হয়, কথা হয়।

ফোনে কয়েকবার ইন্দ্রনাথ, শুভময়, সুশীল, খাইরুল, সৌমিত্র, সুদীপ্ত এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে খুব ভালো লাগে।

খাইরুল এখানে এসেছিল, দেখা হয়েছিল।ভালো লাগলো।

অনেকেই কোথায় কোথায়, কে কোথায় জানি না, দেখা হবে কিনা জানিনা।

জানিনা সামনাসামনি কার সঙ্গে দেখা হবে ? কবে দেখা হবে ? প্রশ্নের শেষ নেই।

উত্তর না জানা।

কিছু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা, সকলে মিলে বেঁচে থাকা।

আর ভালোলাগা, দেখা হবে এই আশায় বেঁচে থাকা ।



মেকানিকাল। শৈশব ও কৈশোর।চন্দননগরে। ১৯৮৪ তে খড়গপুর আই আই টি থেকে স্নাতকোত্তর । ২০০১ এ কেমটেক্স-এ কর্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বদলি। ২০০৭ থেকে হিউস্টনের অনতিদূরে সুগারল্যান্ড শহরে বাস। জ্যাকবস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কর্মরত। দুই কন্যা । বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অস্মিতা হিউস্টনে কর্মরতা। ছোটো, মৌমিতা-র জনস্বাস্থ্য নিয়ে পড়াশোনা চলছে অস্টিনের ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস-এ। স্ত্রী রিনা, আংশিক সময়ের শিক্ষিকা।

অ্যালবাম-১। শ্রেতা ঘোষ



তেলরঙে আঁকা


সুশান্ত ঘোষ, মেকানিকাল, - এর কন্যা, বিবাহিতা।নিউ জার্সি নিবাসী



দিনলিপির কয়েকটি পাতা ।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রাক্ কথনঃ মা বাবা সহ সমস্ত গুরুজন, আপনজন, অগ্রজ, অনুজ, বন্ধু বান্ধব, শত্রুমিত্র যাঁদের সান্নিধ্য আজ এই মুহূর্তে বাস্তব জগতে পাই না তাঁরা সকলে আছেন আমাদের অন্তরে, গভীর মননে।তাঁদের সবাইকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ইচ্ছে ছিল, অভিনব প্রয়াস ‘বেকবিরাশি’-র বেকারিতে প্রথম থেকেই রুটি সেঁকব! সব সময়ে দু’ই আর দু’ই-এ চার হয় না। সেই হিসেবে দ্বিতীয় সংখ্যাটিই আমার জন্যে প্রথম।প্রায় চার দশক পরে, একেবারে নিজেদের কাগজে প্রথম লেখায় কিছু স্মৃতিচারণা আর নস্ট্যালজিয়া নামক উদ্ভট জঘন্য রোগের প্রকোপ প্রকট হবে এটাই স্বাভাবিক।সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আর সম্পাদকমন্ডলী নামক দোর্দন্ডপ্রতাপ দন্ডমুন্ডের কর্তারা অর্বাচীনের এহেন অনির্বচনীয় ধাষ্টামো নিজ গুণে ক্ষমা করে পরবর্তীতে আবারো সুযোগ দিলে তখনই হবে আসল ‘জলওয়া’।

স্থান, কাল, পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লেখাটিকে অযথা ভারাক্রান্ত করার প্রয়াস নেই।মনে হয় কম বেশী ১৯২ জন (ই)মেলবদ্ধ প্রাক্তনির জন্য ঈশারাই কাফি।সকলেই না হলেও অনেকেই ঘটনাবলীর সঙ্গে হয়ত একাত্ম হবেন।তার বাইরেও এক বিপুল সংখ্যক পাঠক পাঠিকা রচনার সামগ্রিক রসাস্বাদনে

বঞ্চিত হবেন না এমনটাই কাম্য।খুউ-উ-ব কম নাম ব্যবহার করা হয়েছে, কাউকেই আহত বা মহান করার অভিপ্রায়ে নয়।বলাই বাহুল্য, পাতার নম্বর সব কাল্পনিক।বাস্তবে এমন কোনো পাতার অস্তিত্বই নেই।যা আছে, সব মনের গভীরে।তবে বিবরণ অকপট, সেখানে কোনও মিথ্যের বেসাতি নেই।সব মিলিয়ে 'ভালো', 'মন্দ' না নিছকই 'গাল মন্দ'---------- জানাবেন অবশ্যই। ভালো থাকুন।

প্রথম পাতা

"রাধা পেয়ারী, দে দারো না, বন্শী মোরি.........রাধা পেয়ারী..............."।

সম্ভবতঃ দূরের কোনও হস্টেল ঘর থেকেই ভেসে আসছে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বাজা লতাজী-র জনপ্রিয় মীরার ভজনের সেই সুর।আস্তে, অথচ খুবই তীক্ষ্ণ, খুবই স্পষ্ট।বড় বড় গাছপালা ঘেরা বিশাল চত্বর।আলো আঁধারির এই নির্জন পরিবেশে মনটা কেমন বিষণ্ন হোয়ে ওঠে হঠাৎ।সেই অর্থে আজই তো প্রথম বাইরে কোথাও রাত কাটানো।দমদম থেকে শিবপুর দূরত্বটা কম নয়। তায় আবার কাল সকালেই ইন্টারভিউ।চাকরির নয়, শিবপুরের কারিগরী কলেজে ভর্তি হবার।পাশের পাড়ার যীশু বাবু অভ্র-র বাবার বিশেষ পরিচিত।তাঁর এক মাত্র ছেলে গৌতম শিবপুর বি ই কলেজে যান্ত্রিক প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।তাই সাব্যস্ত হল গৌতমের সঙ্গে আগের দিন চলে যেতে হবে সেখানে। গৌতমের পোশাকি নাম ইন্দ্রজিৎ দত্তচৌধুরি।দমদম থেকে ১১-এ বাসের দোতলায় চড়ে হাওড়া, সেখান থেকে ৫৫ নম্বরে

শিবপুর।বাসে উঠে ইন্দ্রদা বলছিল, ‘হস্টেল লাইফ, এখানে সব কিছু কিন্তু এক রকম নয়’।কেন বলেছিল কথাটা তখন ঠিক না বুঝলেও পরে মনে হয়েছিল আচমকা বখাটে ছেলে ছোকরাদের কাঁচা খিস্তী খামারি শুনতে হতে পারে বা বিশদৃশ কোনো আচরণের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই বলেছিল কথাটা।দিনের শেষাবধি অবশ্য তেমনটা কিছু ঘটেনি।কলেজ গেটে নেমে হাঁটা পথে সাহেব পাড়ার সেনগুপ্ত হলের চারতলায় সিঁড়ির সামনের ঘরটায় গিয়ে উঠল তারা।শুনল ১২৩ একরের এই ক্যাম্পাসের দু’প্রান্তে দু’টি পাড়া।হস্টেলগুলো দু’টি পাড়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।ওপ্রান্তের পাড়াটির নাম মুচিপাড়া।রাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছে।তাই আজ আর নৈশকালীন আহারের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া গেল।

পরদিন সকালে ইন্দ্র দা সামনের ক্যান্টিন থেকে চিনি মাখানো মাখন টোস্ট, বড় এলাচের দানা দেওয়া কড়া পাকের ক্ষীরের সন্দেশ আর চা নিয়ে এল।প্রতিটি তলেই নাকি এরকম এক একটি ক্যান্টিন আছে।বেশ মজার তো! সকাল আটটায় ইন্দ্র দা ক্লাসে চলে গেল।অভ্রজিৎ মুখার্জির ইন্টারভিউ ন’টা নাগাদ।

সাতচল্লিশ পাতা

সেদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার।আগের দিন রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিটা কখনো অঝোরে, কখনো বা টিপটিপ করে পড়েই চলেছে।পূর্বাভাষে জানা যাচ্ছে, বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হতে পারে।দুপুরের পর থেকে আবহাওয়া ক্রমশঃই আরো গম্ভীর। বিকেলের দিকে অভ্র আর সিদ্ধার্থ ঠিক করে ফেলল এই বেলা

মানে মানে কেটে পড়তে হবে।এটা অবশ্য হঠাৎ গজিয়ে ওঠা খুব একটা নতুন বিষয় নয়।হস্টেলে ওরা দু'তিন রাতও টানা থাকতে পারে কিনা সন্দেহ।অথচ ঘোষ তাপসের বাড়ী কোলকাতার তালতলায় হলেও সে ব্যাটা দিনের পর দিন টানা পড়ে থাকে হস্টেলে।পরীক্ষার সময়তো মাস কাবারও হয়ে যায়।কি করে যে পারে! প্রসঙ্গত, ওরা তিন জন মুচিপাড়ায় ১৩ নম্বর হস্টেলের তিন তলার একটি ঘরের রুম মেট।আগে গৌতম ছিল।কিছু দিন আগে সে অন্য একটা ঘরে সরে গিয়েছে।সেই যায়গায় তাপস। সে 'কবিসেনা' গোষ্ঠীর এক জন সক্রিয় কবি।'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ আছে।নিয়মিত রবীন্দ্রসদন বা জোড়াসাঁকোয় কবি প্রণাম করে, বই মেলায় যায়।সেই অর্থে গৌতম একটু বোহেমিয়ান গোত্রের।সেদিন নাকি ফার্স্ট গেটের সামনে কোমরের বেল্ট খুলে ইউনিয়ানের নামজাদা এক সিনিয়ার দাদাকে পিটিয়েছে।কখনও সখনও হস্টেলের লবিতে জন্মদিনের পোশাকেও ঘুরেছে।সিদ্ধার্থ সম্ভবতঃ তার আঁতেলিয়ানার জেরেই এই ফার্স্ট ইয়ারের প্রাক্কালেই একটা যুৎসই তকমা পেয়ে গেছে- 'ঘ্যাম'।আর আদ্যন্ত মুখে রুমাল লাগানো, চোয়াল চিবোনো, রাফ্-এন-টাফ্ অভ্রের শত্রুআর মিত্রের সংখ্যা যথাক্রমে কম এবং নেহাৎই কম।

মেঘের ঘনঘটায় বিকেলেই বেশ আঁধার।এই সময়ে বেরিয়ে পড়লে পাবলিকের আওয়াজ খেতে হবে না।নাহলে তাদের এই হুট বলতে পালিয়ে যাওয়াতে বজ্জাত ছোকরাগুলো যা আওয়াজ দেয়।আর একজন দু'জন তো নয়, হুক্কা হুয়া শুরু হলে সব শেয়ালের এক রা।তাড়াতাড়ি ফটিকদা-র ক্যান্টিনে চা, নাস্তা

করে কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ ঝুলিয়ে বট’স্-এর এক নম্বর গেটের দিকে পা বাড়াল অভ্র আর ঘ্যাম।না, ভাগ্যি ভালো।আজ আর কেউ লক্ষ্য করেনি।কিন্ত এক নম্বর গেটের বাস স্ট্যান্ডে এসে একরাশ হতাশা।রাস্তার অবস্থা নাকি অত্যন্ত খারাপ।তায় আবার আজ লোকজনও কম।সন্ধ্যে হয়ে আসছে।চারদিক নাকি জলে থৈ থৈ।আজ বোধহয় বাস পাওয়ার আশা নেই।প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট/এক ঘন্টা অপেক্ষার পর হঠাৎই শুনল একটা ৫৫ নম্বর এখনই ছাড়বে।তবে তরী শেষ পর্যন্ত ঘাটে ভিড়বে কি না তার কোন গ্যারান্টি নেই।

হাওড়া পৌঁছে তো অবস্থা আরও শোচনীয়।বহু মানুষের জটলা, যানবাহন অপ্রতুল।বেশ জলও জমেছে দিকে দিকে।বহুক্ষণ হা পিত্তেশের পর মানিকতলাগামী একটা বাস পাওয়া গেল।তাই সঙ্গী।যতটা এগোনো যায়।কিন্তু মানিকতলার পরে রাস্তায় সত্যিই তালা।আর কিছুতেই এগোনোর উপায় নেই।সিদ্ধার্থ বলল তার স্কুলের বন্ধু সুগতদের বাড়ী খান্নার কাছাকাছি।এইটুকু পথ পায়দল মেরে সেখানেই থানা গাড়া যাক আজ রাতের মতন।অভ্র একটু কিন্তু কিন্তু করলেও শেষটায় এই প্রস্তাবে সায় দিতেই হল। বাস্তব যে বড়ই কঠিণ।অভূতপূর্ব দুর্যোগের বেশ রাতে এই দুই অযাচিত অতিথিদের দেখে গৃহস্বামীরা অবশ্যই যে আহ্লাদে আটখানা হলেন না একথাই হয়ত ঠিক।সুগত-র বাবা মা দু’জনেই সেই সময়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক, অধ্যাপিকা।শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা রসায়নের নামী অধ্যাপক আর তাঁর স্ত্রীও বেথুন কলেজে গণিতের একজন নামী অধ্যাপিকা।সুগত আর জি কর মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র।সুতরাং দুর্যোগের রাতে

ছাত্রেরা বিপদে পড়েছে এই ধারণা থেকেই হোক বা স্বভাবসিদ্ধ ছাত্র বাৎসল্য বশতঃই হোক তাঁদের মধ্যে বিরূপ কোনো কিছুর আভাষ পাওয়া গেল না।বরঞ্চ মনে হল খুশীই হয়েছেন।দেখা গেল তাঁরা বেশ অসুবিধের মধ্যেই পড়েছেন।দোতলা বাড়ীটার এক তলা জুড়ে প্রায় হাঁটু জল।উঠোনের কোণে একটি বাথরুমে উপচানো জলে কিছু মনুষ্য বর্জ্য ভাসছে।রান্না ঘর সহ সব ঘরেই থই থই নোংরা জল।চিলে কোঠার ঘরে একটা বড় খাটে সুগত, সিদ্ধার্থ আর অভ্রের স্থান হল।গৃহস্বামীরা তাঁদের সাধ্য মতন গামছা, লুঙ্গি, পায়জামা দিলেন।সারাদিনের ধকল শেষে রাতে খিচুড়ি ভোজনের পর আরামের ঘুমে ডুবে যেতে বেশী সময় লাগলো না।

পরদিন সকাল থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হল।আর দেরী না করে সিদ্ধার্থ, অভ্র আবার পথে।শ্যামবাজারের কাছাকাছি একটা উত্তর শহরতলীমুখি বাসে উঠে দমদম চিড়িয়ামোড়ে নামল দু'জন।দমদম রোড আর পাইকপাড়ার রানী রোডে বাড়ীর পথে রওনা হল তারা।

আয়লা, লায়লা, বুলবুল, উমপুন এবং অতি হাল আমলের ইয়াশ ঝড়ের তাণ্ডব আর ধ্বংসলীলার সঙ্গে কমবেশি পরিচিত সকলেই। কিন্তু ভয়াবহতার নিরিখে '৭৮-এর সেই বন্যা আজও সমান তালে আলোচ্য।হস্টেলে আটকে পড়া ছাত্র, ছাত্রী, অন্যান্য মানুষজন বেশ ক'টা দিন নিদারুণ কষ্টের মধ্যে ছিল সেই সময়। খাদ্য, পানীয় জল, দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জলের অপ্রতুলতা ছিল ভীষণ প্রকট।

বিরাশি পাতা

বিকেল বেলাটায় মাঝে মধ্যে ওভাল বা লর্ডসের মাঠে খেলতে যাওয়া হয়।বেশীর ভাগ দিনই কিন্তু বৈকালিক ভ্রমণের স্থান, হয় বটানিকাল গার্ডেন উর্ফ বট'স অথবা ক্যাম্পাসের পিছন দিকটায় গঙ্গার ঘাটে।কেউ কেউ লিপি তে সিনেমা দেখতে চলে যায়।আজ ওরা কয়েকজন গঙ্গার ঘাটে গেল।বিকেলের দিকে সেখানে দেহাতি মহিলারা স্নান করতে আসেন, সংলগ্ন মন্দিরে পূজো চড়ান।ঘন্টা বাজে ঢং ঢং শব্দে।কলেজের একাধিক ছেলে মেয়ে, স্থানীয় মানুষজনেরাও আসেন গঙ্গার হাওয়া খেতে, আড্ডা দিতে।আর এক জন আসে- রোজ।এক গাঁট্টা গোঁট্টা সুঠাম চেহারার লোক।সম্ভবত হিন্দী ভাষী।প্রত্যেক দিন সে সাঁতার দিয়ে মাঝ গঙ্গা কি তারও বেশী দূরে চলে যায়।সাঁতার শুরু হবার পর থেকে ক্রমশঃ ছোটো হতে হতে এক সময় বিন্দুতে পরিণত হয়ে মিলিয়ে যায় তার অবয়ব।আবার ধীরে ধীরে প্রতীয়মাণ হয় একটি বিন্দু।ক্রমে ক্রমে বড় হতে হতে এক সময় আবারও সে ফিরে আসে ঘাটে।তখন আশপাশের জনতা বিস্ময়াবিষ্ট, কৌতূহলী চাহনিতে তীব্র জরিপ করে চলে তাকে।মানুষটার শরীরী ভাষায় তখন প্রবল আত্মবিশ্বাস, বিশ্ব জয়ের দ্যোতনা!

গঙ্গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় ক্ষিধেটা চাগিয়ে ওঠে।তখন তাদের গন্তব্য হয় বট'স সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ডে।সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হরেক কিসিমের দোকান।ছোটো খাটো মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, ভাতের হোটেল।কোথাও তেলে ভাজা চলছে।গজা, জিলীপি, পেরাকির নানান আয়োজন।পাশের সন্ধ্যা বাজারে তো

মাছ, মাংস, ডিম কাঁচা আনাজের হরেক সম্ভার।তাদের রুটিন গন্তব্য অবশ্য একটু অন্য রকম।পাঁড়ে জী-র দোকানে ভাঁড়ে ফেনা ওঠা, চিনি মেশানো গরম দুধে চুমুক দিয়ে ফিরে আসে তারা।

আজ হস্টেলে ফিরে ওরা একটা চাপা উত্তেজনার আঁচ পেল। চারিদিকে যেন একটা সাজ সাজ রব চলছে।একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব! ছান বিন করে জানা গেল রাতে স্থানীয় নস্কর পাড়ার বাহিনী হস্টেল অ্যাটাক করবে।এমনটাই খবর আছে।কোনো এক দল ছাত্র সে পাড়ায় গিয়ে নাকি ব্যাপক ঝাড়ি করেছে।এক আধটা দিন তো নয়, এ তো প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে।আজ নস্কর বাহিনী এর একটা হেস্ত নেস্ত করবেই করবে।শোনা গেল হস্টেলের ছাদে আর ওপর তলা গুলোতে অঢেল থান ইঁট, আধলা ইঁট জড়ো করা হয়েছে।মজুত হয়েছে দেদার বাঁশ, লাঠি।রাত জেগে আজ পাহারা দেওয়া চলবে সম্ভাব্য বহিরাগত আক্রমণ ঠেকাতে। সন্ধ্যে গড়াতেই ছেলের দল শুরু করল ‘ম’, ‘ব’, ‘শ’-কারান্ত অশ্রাব্য খিস্তী খেউড়ের ফোয়ারা।যেন ফুলঝুরি ফুটছে; তুবড়ির পর তুবড়ি উড়ে যাচ্ছে অজানা শত্রুশিবিরের উদ্দেশে। ওই আপাত শান্ত, গভীর গহীন নিম ঝিলের জলে পরতে পরতে উঠছে উথাল পাতাল ঢেউ।এমন কি নিরীহ গোবেচারা পাঁজাও আজ কাঁচা মাটীর ঘ্রাণ যুক্ত অশ্লীল খেউড়ে বেপরোয়া মত্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ।বেশ অসুর অসুর চেহারার হলেও সুদূর কোনো গ্রাম থেকে আসা পাঁজা কিন্তু আদপে ভালো ছেলের দলেই পড়ে। আশপাশেই স্টাফ্ এবং অধ্যাপকেদের ফ্যামিলি কোয়ার্টারস। এদের কি কোনো আক্কেলই নেই?

বেশ রাত পর্যন্ত অবশ্য ক্লাইম্যাক্স আর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল না। কিছুই হল না।এবং ভুল বলা হল।আক্রমণ একটা হল।বহিঃশত্রুর নয়।আভ্যন্তরীণ।তখন বেশ রাত।অভ্র, সিদ্ধার্থ আর তাপস ঘুমিয়ে পড়েছিল।হঠাৎই ‘ধড়াম’ শব্দে দরজায় লাথি মারার আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দিনের দরজার পাল্লা থেকে লোহার ছিটকিনি ঠনাৎ করে ভেঙ্গে গিয়ে দরজা হাট।আচমকা ত্রস্তে উঠে পড়ে তারা।বাইরে কিন্তু সব চুপচাপ, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।এ তবে নির্ঘাৎ পয়মাল তিলে বিচ্ছু গুলোর কাজ যারা নিত্যদিন নানান মতলব খাটায়, ফন্দি ফিকির করে আর আপাত নিরীহ ভালো ছেলে গুলোর পিছনে লাগে।কিছুটা পরে দরজার খোলা পথে এগিয়ে এল লম্বা করে পাকানো খবরের কাগজের এক জ্বলন্ত মশাল।আর বাইরে শুরু হল কুকুর, বিড়াল, শেয়ালের ডাক।নানা টিকা টিপ্পনী ইত্যাদি।শুরু হল আরেক প্রস্ত খিস্তী খামারি।অবস্থা চরমে ওঠার পরে সাব্যস্ত হল আগামী কাল সকালেই হস্টেল সুপার আনারকলি-র বাড়ী গিয়ে লিখিত অভিযোগ নামা দাখিল করা হবে।একেবারে নাম ধরে ধরে। আনারকলি মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক।এটি তাঁর আসল নাম না ছেলে ছোকরাদের দেওয়া নিক্ নেম কে জানে? ভালো জিনিসের খবর তো মানুষ রাখে না।অথচ এটা জানা হয়ে গেছে যে মেকানিক্যাল বিভাগেরই এক জুনিয়ার অধ্যাপক বিশ্বনাথ নাকি আনারের হবু জামাই।তাঁর সেই এক মাত্র মেয়ে আবার বি ই কলেজেই পড়াশুনো করে।

সাত সকালেই আঁতেল ঘ্যাম এক জবরদস্ত নালিশ নামার মকশ করে ফেলল।তাতে কতকগুলো জুতসই শব্দ যেমন ‘বার্নিং

মশাল', 'ডল ড্রাম', নাইট মেয়ার', 'হরিবিল' ইত্যাদি শব্দগুলি ঢোকানো হল ঘটনার গ্র্যাভিটি বাড়ানোর জন্যে।ক্লাসে যাবার আগেই ওরা তিনজন আনারকলির ফ্ল্যাটে গিয়ে চিঠিটা ধরিয়ে এল।ধরিয়ে তো দেওয়া গেল।ফয়সালা কিছু হবে কি না কে জানে।কেনণা আনারকলি একটু বিন্দাস ধরণের।তিনি একটু রসে বসে থাকেন।তাঁর প্রতিটি সন্ধ্যাই নাকি হয়ে ওঠে রঙিণ। তবে আশ্চর্যজনক ভাবেই মাতব্বর ছেলের দল ডাক পেল।পার্থ-র নেতৃত্বে বেশ কিছু বিটলে বামন বিকেলে তাঁর ফ্ল্যাটে হাজিরা দিতে গেল।কিন্তু কি পরিহাস! ফিরে এসে পার্থ ছরকুটে হেসে বলে, 'কি রে, নালিশ করে বালিশ পেলি'? আশপাশে দাঁড়িয়ে তার স্যাঙাৎরাও যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে তখন।পার্থ জানাল আনার না কি তাদের চেয়ারে বসিয়েছে, দামী কাপে চা বিস্কুট খাইয়েছে।সাধারণ গল্প গুজব হয়েছে।তবে যাই বলুক আর তাই বলুক – পরবর্তী সময়ে এহেন অনভিপ্রেত উৎপাৎ কিন্তু একদম কমে গিয়েছে।

একশ'নয় পাতা

কিছুদিন আগে একটা মিনি আন্দোলন হয়ে গেল।ইদানিং রাতের রুটিটা পাতে দেওয়ার মতন হচ্ছে না।বালি কিচকিচে, কখনও কাঁকড়, আধা কাঁচা আধা পোড়া।সুপারকে স্যার কে বহুবার বলেও কোন কাজ হচ্ছে না।সেদিন রাতে ঠিক হল নমুনা রুটি নিয়ে প্রিন্সিপাল প্রফেসর শীলের বাড়ী যাওয়া হবে।কিন্তু রাতের বেলায় প্রিন্সি-র বাড়ীর দরজা খুলল না।বাইরে বিস্তর খাই খিচুড়ি করেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল না।অগত্যা থরে থরে

নমুনা রুটি তাঁর বাংলো বাড়ী সংলগ্ন মাঠের কাঁটা তারের বেড়ায় গেঁথে দিয়ে পিঠটান।সেই রাতে পূর্ণিমা ছিল না।অতএব চাঁদের সঙ্গে শ্রী যুক্ত রুটির তুল্যমূল্য কোনও বিচার হয়নি।দেখা যাক, সকালে ঘুম থেকে উঠে এইসব প্রিন্সি-র নজরে পড়ে কি না।রুটি তাঁর নজর বন্দী হোয়েছিল, না রাতের বেলায় ধেড়ে মেঠো ইঁদুরের দল সেসব মেরে দিয়েছিল কে জানে? রুটির জেল্লা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

অভ্রজিৎ কোন মাসেও মেস ম্যানেজারি করে না।বলা ভালো, পায় না আরকি।তবে মাঝে মধ্যে মেস ডিউটি পড়ে।কোনো এক মনোরম সাত সকালে সে মাসের ম্যানেজার সাহেব ঘরে এসে খাট বা টেবিলের ওপর ঝনাৎ শব্দে মেসের চাবিটা ফেলে দিয়ে বলে যায়, ‘আজ তোর ডিউটি’।মানে আজ ক্লাসে যাবার বারো বেজে গেল।কাজ তো ওই ভাঁড়ারের চাবি খুলে দেওয়া, আনাজ পাতি চাল ডাল আটার ওজন দেখা।আর হ্যাঁ, কোনো মক্কেল চুরি চামারি করে সটকে পড়ছে কি না সেই খেয়াল রাখা।ম্যানেজাররা তাও মাস ভর মুফতে খেতে পারে।তাদের সেই মাসের মেস চার্জ দিতে হয় না।এমনটাই নিয়ম।ডিউটি ওয়ালাদের কাজটা ছ’কেলাস, থ্যাঙ্ক লেস।

মেস মানি-র বহরটা ইদানিং ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।আগেতো ১৫/২০ টাকায় হয়ে যেত।কিছু কিছু আহাম্মক ম্যানেজার ভালো মন্দ খাইয়ে বিলটাকে উঁচু পর্দায় নিয়ে যাচ্ছে।এখন তো প্রায়ই ৩০/৩৫ টাকা হোয়ে যায়।কি আর আহামরি মেনু? মাসে একদিন আই ডি (ইম্প্রুভড ডায়েট) আর একদিন জি এফ (গ্র্যান্ড ফিস্ট)।

বাকী দিন তো সেই ‘থোড় বড়ি খাড়া’, ‘খাড়া বড়ি থোড়’।ভাটু পালের ম্যানেজারিতে তো অঙ্কটা পঁয়তাল্লিশেও পৌঁছে যায়।তবে ভাটু পাল খাওয়ায় ভালো।তাকে ভজিয়ে, টুপি টাপা দিয়ে ভালো মন্দ খাওয়ার ফন্দি ফিকির করা যায়।সে ‘ম্যানেজ’ হয় ভালো। আই ডি বা জি এফ-র দিনে তো হরবখত্ ফ্রায়েড রাইস, নারকোল দেওয়া ঘন ছোলার ডাল, ঝিরি ঝিরি আলু ভাজা, চিকেন কষা অথবা মাটন কারি, আনারসের রসালো চাটনি, রসগোল্লা, আইসক্রীম খাইয়েছে।ওই ভজানি দিয়ে, বার খাইয়ে মাঝে মধ্যেই তার সঙ্গে জুটে যায় শিশির ঘোষের ছানার পায়েস, রাজভোগ মায় মিষ্টি পানও! এ হেন লেহ্য পেয় খাওয়ার সময় মনে থাকে না।মাস পয়লা মেস বিলের অঙ্কটা দেখলেই মাথা খারাপ।‘শ’-এ আকার ‘ল’-এ আকার বরাহ নন্দন বলে গাল পাড়তে ইচ্ছে করে।একবার এক আহাম্মক ডিনারে তো মোগলাই পরোটারই ব্যবস্থা করে ফেলল।যত পার খাও মোগলাই।লিপি-র সামনের মোগলাই খানার দোকানটা থেকে কারিগর নিয়ে আসা হল এই জন্যে।কারণ মেসের বাঁধা ঠাকুরেরা এসব পারে না। কিন্তু কোন্ মাঈ কা লাল দু’টোর বেশী তিনটে ওই অখাদ্য হজম করতে পারে? বিটা তো নৈমিত্তিক পেটের যোগ ব্যায়াম করে আর সকাল বিকেল চিনি দিয়ে চিঁড়ে ভিজে খায়।জগন্নাথ অর্থাৎ জগা গাঢ় নীল রঙের মোটা কাচের বোতল বোতল মিল্ক অব্ ম্যাগনেশিয়া সাবড়ে দিয়েও নিত্যি দিন কাঁদুনি গায় যে তার সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না।এই তো সব এলেমদার মাল! তাদের আবার ‘কেলেম’ যত পার খাও মোগলাই।যত্ত সব।মেসের বিলটাও গেল বেড়ে।

আর মাসের শেষে ভাঁড়ে যখন ‘মা ভবানী’ তখন নিতান্তই গরিবীয়ানার মেনু।তবে সেটাই আসলি পরমান্ন! ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, সর্ষের তেল পেঁয়াজ কুচি দেওয়া সেদ্ধ মুসুরির ডাল, আলুর চপ, ডিম সেদ্ধ আর পেঁয়াজের চাটনি।হ্যাঁ; বটঠাকুরের মাষ্টার স্ট্রোক, না কি নেহাৎই ‘বাঁয়ে হাতকা’ তুড়ি মারা মাস্তানির এহেন অভিনব অনাস্বাদিত পেঁয়াজের চাটনির রেসিপি তো আজ অবধি কোনও ডাক্ সাইটে রন্ধন পটিয়সী উদ্ভিন্ন যৌবনা গরবিনীর অভিধানেই খুঁজে পাই না!.



উত্তর কলকাতা নিবাসী যান্ত্রিক প্রকৌশলী; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যান্ত্রিক প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপনারত। ১৯৯০ – ২০০৫ সময়সীমায় আনন্দবাজার, বর্তমান, ওভারল্যান্ড, আজকাল, দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ফ্রী লান্স বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সাংবাদিকতা সহ এতাবধি আনন্দমেলা, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, নিবোধত এবং নানান লিটল ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ভ্রমণ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে কমবেশী ৩০০ লেখালেখি। প্রধান নেশা পর্যায়ক্রমে সঙ্গীত, ভ্রমণ, ফোটোগ্রাফি।



অ্যালবাম-১। শাশ্বত ভৌমিক



কালি-কলম ড্রইং



Shashwat, son of Samir Bhowmick। A mechanical engineering graduate from VIT, Vellore who is a passionate Parliamentary Debater and follower of Current Affairs. He is a Yoga enthusiast

এক বিকেলের বৃষ্টিতে । দেবাশিস রায়

(চরিত্র : সূত্রধার, মেঘ, বৃষ্টি)

সূত্রধার : বৃষ্টিটা আরও ঝেঁপে এল ।সকাল থেকেই এরকম । কখনও বাড়ছে কখনও একটু কমছে ।সবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল ।এরই মধ্যে আলো যেন মরে আসছে ।বাইরের ঘরে গান বাজছে ।না, সিডি নয়, লং প্লেয়িং রেকর্ডে ।রাগ জয়জয়ন্তী । গান শুনতে শুনতে লেখাগুলোয় আলগাভাবে চোখ বোলাতে থাকে মেঘ।ভিতরে ভিতরে একটু অধৈর্যও হতে থাকে ।এতক্ষণে তো এসে পড়ার কথা ছিল ।গান শেষ হল ।উঠে গিয়ে এবার রেকর্ডটা বদলে দিলো মেঘ ।এবারে নজরুলের গান ।এটাও বর্ষার ।বাইরে এমন বৃষ্টি, ঘরেও গানের বর্ষা নামুক ।

(নজরুলের বর্ষার গান বাজছে)

(ডোর বেলটা বেজে উঠল ।দরজাটা খুলতেই হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল বৃষ্টি ।ম্যান্সক্রিপ্টের ব্যাগটা টেবিল এ নামিয়ে রাখতে রাখতেই শেষ হয়ে এল গান)

মেঘ : তোর এত দেরি হল যে ?

বৃষ্টি : দেরি মানে ? দেখছিস না কীরকম বৃষ্টি ? বাড়ি থেকে তো বেরোস নি ; বুঝতেই পারছিস না সব জায়গা কীরকম জল থই থই ।

মেঘ : কত কাজ এখনও বাকি সেটা বুঝতে পারছিস বৃষ্টি ?

এই দেখ, এখনও এতগুলো লেখা কম্পোজ করতে দেওয়া বাকি ।

বৃষ্টি : চিন্তা করিস না ।হয়ে যাবে ।পুজোর এখনও দু' মাস বাকি ।চল চল, বারান্দায় চল ।তোর বারান্দা থেকে বৃষ্টি দেখতে ফ্যান্টাস্টিক লাগে ।

মেঘ : হাওয়া টা বাড়ল ।বৃষ্টির ছাঁট, হাওয়া সব মিলেমিশে.......

বৃষ্টি : আহা ! অপূর্ব ! এই সময় রবীন্দ্রনাথ---রবীন্দ্রনাথ !

মেঘ : রবীন্দ্রনাথ ? বেশ, কোন গান মনে আসছে বল ?

বৃষ্টি : উতল হাওয়া বাদল ঝরে (সুরে গায়)

(মেঘ পরের লাইন টা গায় ।দুজনে মিলে গাইতে থাকে)

(এর মধ্যে ওরা বারান্দা থেকে ফিরে এসেছে ঘরে ।রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ডটা আবারও পালটে গেছে ।'আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন' গানটা হচ্ছে)

মেঘ : লতার এই গানটা শুনতে শুনতে আমার আবার হেমন্তর গানটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ।

২

বৃষ্টি : কোনটা ?

মেঘ : 'এই মেঘলা দিনে একলা'

বৃষ্টি : আছে তোর স্টকে ?

মেঘ : কী শুনবি বল না ? তুই তো জানিসই বই আর রেকর্ড --- দুটোর স্টকই আমার খুব খারাপ না ।

বৃষ্টি : ও ! স্টক নিয়ে তোর খুব পায়াভারি হয়েছে ? ছাড় ছাড় ......

মেঘ : রেকর্ডটা বার করি ।

বৃষ্টি : 'মেঘলা দিনে' বলে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে 'লিপিকা'য় ।শুধু ওই একটাই নয়, বর্ষার ওপর 'লিপিকা'য় আরও কয়েকটা কবিতা আছে ।

মেঘ : 'লিপিকা' ? সে তো সব গদ্য ।কবিতা কোথায় ?

বৃষ্টি : কেন ? গদ্যের ফর্মে লেখা হলে তা' কবিতা হতে পারে না ?

মেঘ : ‘সঞ্চয়িতা’তে আছে ‘লিপিকা’র কোনও লেখা ? কবিতা হলে কি থাকত না ?

বৃষ্টি : শোন মেঘ, সঞ্চয়িতার কবিতাগুলো যাঁর সিলেকশন তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ।তাঁকে বোঝা আমাদের মতো আম--বাঙালির কম্ম নয় ।এসব তর্ক ছেড়ে বরং লিপিকাটা খুলে কবিতাটা শোনা ।

(মেঘ কবিতাটা পড়ে ।কবিতা শেষ হয়ে আসে আর 'এই মেঘলা দিনে একলা গানটা বেজে ওঠে)

মেঘ : এই মেঘলা দিনে মন কিন্তু আরও একটা জিনিস চাইছে ।

বৃষ্টি : কী ? কী চাইছে ?

মেঘ : চা ! চা ! চা বলে আসি ।

বৃষ্টি : না না, চা না, কফি হোক, কফি ।

এমন বাদলঘন দিনে \ কফিতে মজিব দুইজনে (দু' জনের হাসি)

(বর্ষার প্রেক্ষাপটে আধুনিক গান বাজছে)

সূত্রধার : গান চলছে ।এর মধ্যে গরম কফি এসে গেছে । সঙ্গে পকোড়া ।গান শুনতে শুনতে মেঘ আর বৃষ্টি পত্রিকার কাজে হাত লাগিয়েছে ।দু' মাস বাদে পুজো ।পত্রিকার শারদ সংখ্যার কাজ একেবারে সময় মেপে করতে হচ্ছে ।যে লেখাগুলো এসেছে, সেগুলো প্রেসে দেওয়ার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হচ্ছে ।যেগুলো কম্পোজ হয়ে গেছে তার প্রুফ দেখার কাজটাও এই অবকাশে সেরে নিতে হচ্ছে ।

৩

(বৃষ্টি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি করে)

মেঘ : কার কবিতা এটা ?

বৃষ্টি : বল কার ?

মেঘ : যেমন ছন্দের ব্যবহার আর তেমনি শব্দচয়ন ! শ্রীজাত ছাড়া আর কে হবে ?

বৃষ্টি : মোটেও না ।শক্তি ।শক্তি চট্টোপাধ্যায় ।

মেঘ : কী দারুন কবিতা ! তাই না ?

বৃষ্টি : জীবনানন্দের পর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ।

মেঘ : অথচ দেখ বৃষ্টি, শক্তির কবিতা নাকি বুদ্ধদেব বুঝতে পারতেন না ।শুধু শক্তি নয়, পঞ্চাশের অনেকের কবিতাই---

বৃষ্টি : অথচ বুদ্ধদেব বসু তাঁর পত্রিকা 'কবিতা'য় তো তরুণ কবিদের রীতিমতো প্রোমোট করতেন ।

মেঘ : শেষ অবধি তাঁদের কবিতা বুঝতে পারছেন না বলে 'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন ।

বৃষ্টি : 'কবিতা' যখন বন্ধ হচ্ছে ততদিনে শক্তি সুনীলেরা 'কৃত্তিবাস' বার করতে শুরু করে দিয়েছেন ।

মেঘ : হ্যাঁ, প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাই তো ছিল শঙ্খ ঘোষের ।

বৃষ্টি : শঙ্খ, সুনীল, শক্তি, অলোকরঞ্জন, প্রণবেন্দু এঁদের কথা থাক ।বরং এঁদের কারও কবিতা শোনা ।

মেঘ : তুই শোনা ।দাঁড়া দাঁড়া , কার--- কার--- হ্যাঁ, জয়ের কবিতা বল ।এই সময়ের কবি জয় গোস্বামী ।

(বৃষ্টি জয় গোস্বামীর কবিতা আবৃত্তি করে)

মেঘ : কাজ করতে করতে গান শোনা যাক ।আমার প্রিয় কিছু গান ।

বৃষ্টি : এখনকার ? নাকি আগেকার ? স্বর্ণযুগের ? (হাসি)

মেঘ : স্বর্ণযুগের একাল সেকাল হয় না, বুঝলি ।ভালো গান মানেই স্বর্ণসম্ভাবনা ।

(গান হতে থাকে ।কয়েকটি হওয়ার পর শেষ গানটি হয় রবীন্দ্রনাথের)

বৃষ্টি : সেই রবীন্দ্রনাথ ।এত যে শক্তি সুনীল শঙ্খ অলোকরঞ্জন প্রণবেন্দু কবিতা কৃত্তিবাস-- এই সবকিছুর কথা এল, কী হল ? সব ছেড়ে সেই তো রবীন্দ্রনাথেই ফিরতে হল ।

৪

মেঘ : তাই তো হয় রে বৃষ্টি ।চিরকালই তাই হয় ।আগেও তাই হয়েছে, আজও তাইই হয় ।কৃত্তিবাসই বল আর কল্লোল-- সব যুগের কবিরাই তো চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নিজের রাস্তা খুঁজে নিতে ।অস্বীকার করে বিরোধীতা করে শেষ অবধি রবীন্দ্রনাথেই তো ফিরতে হয়েছে ।বাঙালির নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ।রবীন্দ্রনাথে ।

বৃষ্টি : আর বর্ষার গান মানে তো অবধারিতভাবেই তিনি ।

(আবারও একটি বর্ষার গান)

মেঘ : জানিস, ১৯৪১এ, যে বছর রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ, সেই বছর তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে এরকমই এক বর্ষার দিনে, সন্ধের দিকে, বুদ্ধদেব বসু আর কয়েকজন গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে ।শান্তিনিকেতনে ।কবি তখন উদয়নে । বাইরের ঘরে ওনারই গানের অনেকগুলো রেকর্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ।এই যেমন এখানে এখন রেকর্ডগুলো রয়েছে ছড়িয়ে । ওঁদের দেখে কবি বললেন, "একটা বর্ষার গান evoke করবার চেষ্টা করছিলুম ---- এখন আর হয় না " জানিস বৃষ্টি, বুদ্ধদেব পরে আক্ষেপ করেছিলেন।বলেছিলেন, " শান্তিনিকেতনে বর্ষা এসে কবির অভিনন্দন পেল না এমন ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম " ।

বৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ তো বর্ষার শেষ গান লিখেছিলেন তার আগের বছর ।সম্ভবত সেপ্টেম্বরে ।গানটা ছিল 'এস এস এস শ্যামছায়াঘন দিন' ।রবীন্দ্রনাথের লেখা বর্ষার শেষ গান !

(গানটা দু' লাইন গেয়ে ওঠে বৃষ্টি)

মেঘ : তবে কাব্যগীতি হিসেবে বিচার করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বাদেও বর্ষার যে গান--যে সম্ভার --তা কিন্তু হেলাফেলার নয় ।

বৃষ্টি : হেলাফেলার কথা তো বলিনি ।বলেছি শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা (হাসি) ।এ কী রে ! সাতটা বেজে গেছে।এবার আমায় ফিরতে হবে ।

মেঘ : ফিরবি ফিরবি ।এই রেকর্ডগুলো অনেকদিন বাদে বার করলাম ।এগুলো একটু শুনে যা ।

(গান হতে থাকে)

সূত্রধার : রেকর্ড শুনতে শুনতে আর গল্পে আড্ডায় সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে ।বিকেল অনেকক্ষণ ছুঁয়ে ফেলেছে সন্ধের কপোল ।সন্ধে তরতরিয়ে এগোচ্ছে রাত্তিরের দিকে ।হঠাৎ বৃষ্টি বলে ওঠে :

বৃষ্টি : আচ্ছা মেঘ, বিকেল থেকে এত যে আড্ডা হচ্ছে, গান শোনা হচ্ছে, খেয়াল করে দেখেছিস, আড্ডায় এখনও অনুপস্থিত পূর্ণেন্দু পত্রী ।তাঁকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের আড্ডা, গান, রবীন্দ্রনাথ... হয় ?

মেঘ : ঠিক ।আর পূর্ণেন্দু পত্রী মানে অবধারিতভাবেই 'কথোপকথন' ।

বৃষ্টি : (হাসি) শুভঙ্কর আর নন্দিনী ।আছে তোর কাছে বইগুলো ?

৫

মেঘ : হাঃ , কী প্রশ্ন ! আমার বাড়িতে পূর্ণেন্দু পত্রী তথা 'কথোপকথন' অনুপস্থিত !

বৃষ্টি : আবার ঘ্যাম নেওয়া শুরু করলি ? কথা না বাড়িয়ে বইটা নিয়ে আয় ।

মেঘ : এবার বরং আমরাই হয়ে যাই শুভঙ্কর আর নন্দিনী ।

(দু' জনে 'কথোপকথন' থেকে আবৃত্তি করে)

সূত্রধার : ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর পেরিয়েছে ।বৃষ্টির এবার বাড়ি ফেরার পালা ।আমাদের গল্পেরও শেষ হওয়ার পালা ।বৃষ্টি বাড়ি ফিরে যাবে ।মেঘ হয়তো গুছিয়ে তুলবে রেকর্ডগুলো । বইগুলোকে ফিরিয়ে দেবে বুককেসে ।কিন্তু শেষ অবধি কি কিছুই ওইভাবে গুছিয়ে তুলে রাখা যায় ? বুকের ভেতর ওই রেকর্ডগুলো তো এলোমেলোই পড়ে থাকে ।উড়তে থাকে বইয়ের পাতা । কখনও কোনও নির্জন বা একান্ত মুহূর্তে ওই রেকর্ডে ঠিকঠাক সংযোগ ঘটে রেকর্ড প্লেয়ারের পিনের ।বাজতে থাকে রেকর্ড । উথলে ওঠে গান ।বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসে কোনও কবিতার মুহূর্ত ।মেঘ বা বৃষ্টি আসলে কোনও চরিত্র নয়; এমনকি কাল্পনিক চরিত্রও নয় তারা ।তারা আমাদের অস্তিত্বের আর মনোজগতের টুকরো ।পরম যত্নে নিভৃতে যাদের আমরা লালন করি, ভালবাসি ।

(আবহে বর্ষার গানের সুর বাজতে থাকে)

সমাপ্ত

দ্রষ্টব্য : নাটকটি অভিনয় করতে চাইলে, একটু জানালে নাটককারের ভাল লাগবে



সিভিল । সেচ ও জলপথ দপ্তর থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দু' হাজার কুড়ি তে অবসর গ্রহণ । বর্তমানে হিডকো তে ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ হিসেবে কর্মরত । বাংলা নাটক নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি, 'ব্রাত্যজন' নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী রিংকু, কন্যা রিমঝিম । স্ত্রী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কর্মরতা । কন্যা ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট এ স্নাতকোত্তর করে কর্মরতা ।



সফল আর বিফল উদ্যোগ - কিছু অনুভূতি।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

সূত্রপাত:

মনে পড়ে সেই ১৯৮২ সালের বি ই কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে এম এন দস্তুর-এ ৯ই অগাস্ট জয়েন করেছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।আমরা কলেজের ১০ জন একসঙ্গে দস্তুর-এ এসেছিলাম।সময় কেটে গেলো। আমরা বন্ধুরা অনেকেই এদিক ওদিক অন্য চাকরিতে জয়েন করলাম। আমিও ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তরের অধীনে বিধিবদ্ধ সংস্থা ডাবলু বি আই আই ডি সি তে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগ দিলাম।

দস্তুর এ থাকতে সহকর্মীরা অনেকেই বলতেন এখানে বেশিদিন থাকলে বসার চেয়ারের পায়াটা ৮০ মিলিমিটার ডায়ামিটারের এর হোল্ডিং ডাউন বোল্ট দিয়ে আটকে যাবে, নড়তে পারবে না। আমার ক্ষেত্রে সেটা WBIIDC তে হলো।সেই ১৯৮৫-র ডিসেম্বর থেকে ২০২০-র ডিসেম্বর টানা ৩৫ বছর কেটে গেলো

যেন মনে হয় চোখের পলকে।এর মধ্যে কত কিছু পেলাম আবার অনেক অমূল্য সম্পদ হারালাম।এসব আমাদের সবার জীবনেই ঘটেছে আমার একার অবশ্যই নয়।

যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজটাই মুখ্য ছিল, সময়ের সাথে সাথে দপ্তরের অন্য কাজ গুলোও করবার দায়িত্বও চাপতে থাকলো দিনে দিনে।ছিলাম ইঞ্জিনিয়ার বনে গেলাম ইঞ্জিনিয়ার “ও”। যেমন TATA Steel-এর বিজ্ঞাপনটা ছিল "We also Make Steel”।

এবার শিরোনামের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি।নিজের কথা অনেক বললাম।শিল্প দপ্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব শিল্পদ্যোগকে সহায়তা করা আর তার জন্য খুঁটিনাটি তথ্য উদ্যোগকারীর কাছ থেকে জোগাড় করে শিল্প প্রস্তাব এর সাফল্যলাভের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা।

যা দেখেছি

সমাজে ছোট ব্যাবসায়িক বা শিল্প উদ্যোগীর সংখ্যাই বেশি। উদ্দেশ্য জীবিকার সংস্থান।ওদের পুঁজি কম। আর ব্যাবসায়িক জ্ঞানের বিস্তারও কম।অনেক সময় কিছু করতে হবে এই ভেবে পরিচিত বা অপরিচিত মানুষের কথায় ব্যাবসায় যোগ দেয়। অধিকাংশই অংশীদারী বা একক ভাবে ব্যবসা শুরু করে।এই সব উদ্যোগের সাধারণ বৈশিষ্টগুলো এই রকম :

১. তাৎক্ষণিক বড় রোজগারের আশা করা

২. ভালোভাবে কাজটিকে বিশ্লেষণ না করে দর উল্লেখ করা

৩. প্রতিযোগিতা করে কাজ পাওয়া নিশ্চিত জন্যে অস্বাভাবিক কম দর উল্লেখ করা

৪. অনুমিত ব্যয় আর প্রয়োজনীয় প্রধান ও কার্যকরী মূলধনের সঠিক হিসাব না করা

৫. মূলধনের সঠিক উৎস, তার ব্যবহার, এবং ধার ফেরত দেওয়ার পদ্ধতি, সময়সূচী ও উৎস নিশ্চিত না করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও সময়সূচী গুরুত্ব সহকারে ও সঠিক ভাবে তৈরী না করে কাজ শুরু করা

৭. লাভক্ষতি এবং নগদ প্রবাহের (ক্যাশ ফ্লো) অভিক্ষিপ্ত (প্রজেক্টড) হিসেব না করে কাজে লেগে পড়া

৮. পরিবেশের ক্ষতির কথা, তার সম্ভাব্য ফলাফল ও ব্যাবসায় তার প্রাসঙ্গিক প্রভাবএর ভাবনা না করা

৯. নিয়ন্ত্রক আইনকানুন ও ব্যাবসায় তার প্রভাব সঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করেই কাজে এগোনো

১০. ব্যক্তিগত অথবা পার্টনারদের মধ্যে মতান্তরের কারণে কোনো অংশীদারের মাঝপথে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া

১০. ব্যক্তিগত অথবা পার্টনারদের মধ্যে মতান্তরের কারণে কোনো অংশীদারের মাঝপথে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া

১১. হিসাবে গরমিল ও অংশীদারিত্বে বিশ্বাসভঙ্গ,

ইত্যাদি ....ইত্যাদি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছোট উদ্যোগী ব্যবসা শুরু করে নিজের সম্বল আর পরিজন বা পরিচিতর কাছ থেকে কিছু ধার করে লাভের আশায়।আর উপরে বলা একটা বা মিলিত কারণে কিছুদিনের মধ্যে ব্যাবসায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকে, ধারও বাড়তে

থাকে আর শেষ পর্যন্ত ধার জর্জরিত হয়ে উদ্যোগী ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

উদ্যোগীর প্রত্যাশিত মানসিকতা

আমি মনে করি ছাপোষা চাকুরের থেকে উদ্যোগীর মানসিকতা ভিন্নধারার হওয়া দরকার।একজন উদ্দ্যোগীকে যে ঝুঁকি নিতে হয় চাকুরিজীবীকে তার তুলনাযোগ্য কোনো ঝুঁকিই নিতে হয় না। কোনো সংস্থায় চাকুরীজীবির উদ্বেগ তার উপর আরোপিত কাজ সুসম্পন্ন করা ও নিজের আয় নিশ্চিত করার মধ্যেই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে।অপরদিকে উদ্যোগীকে

- কর্মচারীদের বেতন,
- সংস্থা চালানোর খরচ,
- ব্যাবসার প্রধান ও কার্যকরী মূলধনের জোগাড় করা,
- কাজের প্রক্রিয়ার সঠিক ধারণা করা ও তাকে সময়ানুযোগী করা
- সঠিক মানের ও পরিমানের কাঁচামালের সময়োচিত সংস্থান করা,
- ক্রেতা সন্ধান করা,
- উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করা,
- দ্রুত বিক্রয় আয় সংগ্রহ করা
- সরকারী বিধিনিষেধ মান্যতা নিশ্চিত করা
- সঠিক হিসাবরক্ষণ ও হাল-নাগাদ লাভ ক্ষতির ধারণা রাখা
- সময়মতো বিভিন্ন কর ও রিটার্ন জমা দেওয়া
- কাজের স্বার্থে ক্লায়েন্ট ও সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সদ্ভাব রাখা

- ব্যাংক ও অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতি নিয়মের আপ টু ডেট ধারণা রাখা
- সমাজ ও পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করা।...

এসব সবই নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হয়।তাই উদ্যোগী কোনো ভাবেই একজন অতি সাদামাটা, ছাপোসা মানুষ হবেন না। কারণ তাঁকে

- ধৈর্য্য ,
- সহনশক্তি,
- বিচারবুদ্ধি ,
- দায়িত্বশীলতা,
- সৃজনশক্তি,
- সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা
- প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা
- প্রভাবিত করার ক্ষমতা
- বিশ্লেষণী ক্ষমতা,
- ভাষাগত দক্ষতা,
- বুদ্ধিমত্তা,
- প্রতুৎপন্নমতিত্ব
- সততা
- কর্মদক্ষতা
- ব্যাবসায়িক বিষয় সংক্রান্ত স্পষ্ট জ্ঞান
- প্রজ্ঞা
- সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা

- ভদ্রতা ও দৃঢ়তা

ইত্যাদি।..ইত্যাদি

গুণগুলো খুব ভালো ভাবে অর্জন করতে, বজায় রাখতে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হয়। তাই তিনি উদ্যোগী - মানুষের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত একজন উন্নত মানুষ।

একটা পরিস্থিতির কথা বলি

আমরা যখন দূরপাল্লার রেলগাড়িতে চরে বসি - বার্থটা নামিয়ে মুছে পরিষ্কার করে মালপত্র জায়গামতো রেখে জামা জুতো চেঞ্জ করে আরাম করে বসি।আমরা জানি যে আমরা গন্তব্যে পৌঁছবো। ট্রেনে ওই সময়টা কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও আমরা সংগ্রহ করে নি যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। ট্রেন ঠিকঠাক চললে কোনো টেনশন নেই। লেট করলে টেনশন। ট্রেন প্রায়শই যদি লেট করে তো তার ব্যাবস্থাও আমরা সাধারণত করে রাখি। বেশি করে খাবার ও জল নিয়ে নি বা আর কিছু যা ট্রেনে থাকতে গেলে প্রয়োজন।

এটা কিন্তু লোকাল ট্রেনের যাত্রীর বৈশিষ্ট্য নয়।লোকাল ট্রেনের যাত্রী সজাগ থাকে কখন তার গন্তব্য কাছে আসছে। তাড়াতাড়ি ট্রেনের দরজার এর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, "দাদা একটু সাইড দেবেন - নামবো" বলে কাত হয়ে সহযাত্রীকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বা দুটো অন্য কথা বলে গেটে পৌঁছতে চায়।

দুই ধরনের যাত্রীর মানসিকতার তফাৎটা হলো দূরপাল্লার যাত্রী শান্ত কিন্তু আত্মবিশ্বাসী বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা করেন রেল যাত্রা করার জন্য, আর লোকাল ট্রেন যাত্রী ছটফটে আর

উত্তেজিত "স্টেশনটা না পেরিয়ে যায়" - ওঁর এই যাত্রায় সেরকম বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা করার অবকাশ নেই, পরিবেশ ও নেই। একজন উদ্যোগী অনেকটা লম্বা সফরের যাত্রী বলে আমার মনে হয় যিনি

- শান্ত
- লক্ষ্যে স্থির
- আত্মবিশ্বাসী
- অনুসন্ধানী
- ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারেন
- যত্নশীল
- প্রতিকূল পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবিলা করেন
- ভেবে কাজ করেন - কাজ করে ভাবেন না
- দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও নতুন প্রয়োগ শেখার ক্ষমতা রাখেন

ইত্যাদি

উদ্যোগ শুরুর প্রস্তুতি পর্ব

এবার বলি কোনো উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ গুলোর কথা:

১. প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি বা অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট

উদ্যোগ স্থাপন করার প্রথম ধাপ হল একটি মজবুত প্রতিষ্ঠান ও তার পরিচিতি তৈরী করা।একটু বিশদে বলি:

একজন মানুষের পরিচয় তার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, PAN ও আধার নম্বর, জন্মের তারিখ এসব দিয়ে তৈরী হয়।তারপর তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসাপত্র, বিশেষ কৃতিত্বের মর্যাদা প্রাপ্তি ইত্যাদির

নিরিখে তার পরিচিতি আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রহণযোগ্যতা আরো অনেক বেড়ে যায়।একজন মানুষের এই সব গুণগুলো তাঁর কর্ম -পরিকাঠামো বলা যেতেই পারে।পরবর্তী কাজের ক্ষেত্রে এই সব দক্ষতা তাঁর হাতিয়ার হয়।

অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যাবসায়িক বা শিল্প উদ্যোগের কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একজন ব্যাক্তি মানুষ আর একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। মানুষের মতোই উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানকেও কিছু সরকারী বিধি নিয়ম মেনে বাণিজ্য লাইসেন্স রেজিস্ট্রিকরণ, আয়কর, পণ্য ও পরিষেবা কর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের তালিকাভুক্তকরণ ও এই সব বিষয় সম্পর্কিত নিবন্ধন নম্বর নিতে হয়।সাফল্যের সাথে কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও সুনাম দুইই বাড়তে থাকে। একজন মানুষের মতোই সফলতা প্রাপ্তি হতে থাকে। উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান আর ব্যাক্তি মানুষের মধ্যে তফাৎটা হলো মানব জীবন নশ্বর - একদিন শেষ হবেই কিন্তু প্রতিষ্ঠানের শাশ্বত হতে বাধা নেই।ব্যাক্তিসত্বা স্বতন্ত্র ও একক অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠান এক বা একের বেশি মানুষের সংঘবদ্ধ সংগঠন নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্যে।কাজ করে সুনাম অর্জন এবং প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠান ব্যাক্তি মানুষের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় যেহেতু প্রতিষ্ঠানকে আইনানুগ নির্ধারিত ব্যাবসায়িক বিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হয়।

একজন মানুষকে প্রতিষ্ঠানের উপরে উঠতে গেলে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হতে হয় যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ইত্যাদি।তাই প্রতিষ্ঠান ব্যাক্তির চেয়ে উচ্চতর

সত্তা। প্রতিষ্ঠানকে বহাল রাখার খেতে যত্নও তাই বেশি নিতে হয়।

একটা মজবুত এবং দীর্ঘ মেয়াদী সংস্থা গড়ে তুলতে গেলে কিছু বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত যেমন:

- প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন মেনে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করা। এখানে বলে রাখি যে সংস্থা যত বেশি প্রাতিষ্ঠানিক আইনে বাঁধা, ক্লায়েন্টের কাছে সেই সংস্থা তত বেশী গ্রহণযোগ্য কারণ তার সচ্ছতা সরকার ও ক্রেতার কাছে বিভিন্ন রকমের দাখিলী বিবরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।তাই পার্টনারশীপ বা ব্যাক্তি মালিকানা যুক্ত সংস্থার চেয়ে রেজিস্টার্ড কোম্পানি বেশি গ্রহণযোগ্য। অবশ্যই পরিস্থিতি, মূলধনের সংস্থান ও ভবিস্বতের কর্মপন্থা বিবেচনা করে সংস্থাটির কনস্টিটিউশন ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠাতার বা প্রতিষ্ঠাতাদের উর্ধে উঠে কাজ করবে।
- প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পদ তার অংশগ্রহণকারী ব্যাক্তি অথবা ব্যক্তিগন। ব্যবসা পরিচালনা ও প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি নেবার দায়িত্ব উদ্যোক্তা অথবা উদ্যোক্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মানসিকতা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাঁদের পূর্বে উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া অথবা দ্রুত অর্জন করে নেওয়াতে সচেষ্ট হওয়া বিশেষ বাঞ্চনীয়।
- প্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালনা করা হবে, কার কি দায়িত্ব থাকবে, হিসাব রাখার পদ্ধতি, তার যাচাই করার পদ্ধতি ও

সময়সূচি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ বিবরণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাপত্রের মধ্যে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানকে স্বাচ্ছন্দ্যে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে।

- খুব যত্নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের দর্শন (ভিশন), অভীষ্ট লক্ষ্য (মিশন), আকাঙ্ক্ষা (অবজেক্টিভ) ও কর্তব্য (গোল) স্থির করা দরকার এবং তা অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পন্থা নির্ধারণ করাও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।
- ব্যাবসার ক্ষেত্রে সংস্থার অভ্যন্তরীণ শক্তি (Strength) ও দুর্বলতা(Weakness) এবং সংস্থার বাহ্যিক সুযোগ (opportunity), এবং বিপদের লক্ষণ (Threat), SWOT Analysis - এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে কাজে এগোনো খুবই কার্যকর পদ্ধতি।
- কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকাটা খুবই জরুরী। একটি সংস্থাতে বিভিন্ন রকমের কাজ থাকে। সেগুলোর মধ্যে কিছু গুণ উদ্যোগীর প্রত্যাশিত মানসিকতা আলোচনা করার সময় উল্লেখ করেছি।। কাজের বিতরণ ও সম্বনয় ঠিকমতো না করলে সব দিক ঠিকঠাক রেখে সফলভাবে কাজ শেষ করা আর পর্যাপ্ত লাভ এর দেখা পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।তাই ব্যাবসার কাজ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে করতে গেলে একেবারে শুরুতেই অর্গানাইসেশনাল স্ট্রাকচার তৈরী করে নিয়ে ও প্রতিটি কাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ভাবে বন্টনের করে কাজ শুরু করা উচিত। কাজ সুসম্পন্ন করা ও তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবার জন্য

নিয়মিত কাজের পর্যালোচনা করা এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ এগোনোও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

- প্রতিষ্ঠানের সুনাম নির্ভর করে ব্যাবসার সঠিক ফিজিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল পারফর্মেন্সের উপর। কাজ যদি সঠিক ও সময়মতো হয়, ক্রেতা যদি সন্তুষ্ট থাকেন, ভেন্ডারদের পেমেন্ট সময়মতো ও চুক্তি অনুসারে ঠিকঠাক হয়, ব্যাংকার বা ঋণদাতার ঋণ যদি ঠিক সময়ে পরিশোধ করা যায় আর সর্বোপরি কর্মচারী ও মালিকপক্ষ যদি সন্তোষজনক আয় করতে পারে ব্যাবসাও স্থিতিশীল লাভের মুখ দেখে - ব্যবসা সফল হবেই।এসব ফলের জন্য উদ্যোগীকেই কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নিয়মিত নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।
- প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করবার স্বার্থে সংস্থার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন, নিরলস এবং সুসংহত দলগত প্রচেষ্টার সংস্কৃতির সবরকম উপস্থিতি নিশ্চিত করার কৌশলগত পদক্ষেপ উদ্যোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া খুবই জরুরি।
- ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মানুষজন যেমন ক্রেতা সংস্থার প্রতিনিধি , কর্মচারী, সরকারী ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার আধিকারিক এবং সাহায্যকারী সংস্থা যেমন ব্যাঙ্ক, ঠিকাদার বা বিক্রেতা সংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী করা ও তাদের বিশ্বাস অর্জন করাটা আবশ্যকীয় কর্তব্য।

২. উৎপাদন ও প্রযুক্তি (Production & Technology)

প্রোডাকশন বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্ম-সম্পাদনের সঠিক পরিকল্পনা করা । এই পরিকল্পনার ধরণ কাজের চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।ঠিকাদারি কাজের জন্য এক রকম, সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে অন্য রকম, ইভেন্ট মানাজেমেন্টের জন্য আর এক রকম, শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজে আলাদা রকম , ইত্যাদি ।..কিন্তু এর মধ্যে কমন আক্টিভিটি যেগুলো করতেই হয় সেগুলি হলো:

- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্ল্যান (নকশা) ও স্পেসিফিকেশন বিশদে তৈরী করা ও তা অনুমোদন করিয়ে নেওয়া যাতে কাজ করার সময় পরিবর্তন সর্বনিম্ন হয়।
- কাজের বিষয়ে বিশদে বর্ণিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হওয়াটাও জরুরি কারণ এতে চুক্তিবদ্ধ পক্ষরা প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং শর্তাবলী সম্বন্ধে লিখিতভাবে অবহিত (রেকর্ডেডলি ইনফর্মড) থাকে।
- প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও অন্যান্য সীমিত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতার সাথে ব্যাবহার করে ও সময়ের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালনার কৌশল যেমন PERT, CPM ইত্যাদির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- কাজের বাস্তবায়নের সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিয়মিত লক্ষ্য রাখা বিশেষভাবে জরুরী। কোনো অসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে কাজের অন্তরায় খুঁজে বের করে সংশোধনী প্রক্রিয়া চালু করা অবশ্য কর্তব্য যাতে কাজ সময়মতো ও ঠিকভাবে শেষ করা যায়।

- প্রোডাকশনের সময় কাঁচামালের সঠিক গুণমান বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও স্পেসিফিকেশন মেনে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা।
- সমস্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত, অভিজ্ঞ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীর সাহায্যে উৎপাদিত পণ্যের গুণমান যাচাই করা যাতে ক্রেতা সন্তুষ্টি সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে।
- যত বেশি করে সম্ভব পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির (Eco Friendly Technology) ব্যবহারের ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে জরুরী। বর্জ্য বস্তুর পুনর্ব্যবহার, সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার, দিবালোকের ব্যবহার, বৃষ্টির জলের সঞ্চয় ও ব্যবহার, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি বর্জনকারী বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার এবং সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।
- ব্যাবসার প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সংযুক্তি ও ব্যবহার বিশেষভাবে জরুরী।তা সে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, হিসাবরক্ষণ, ক্রেতা সম্পর্ক পরিচালন, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট যা কিছু হোক। উদাহরণস্বরূপ - মাইক্রোসফট প্রজেক্ট অথবা Primavera সফটওয়্যার ব্যবহার করে খুব সহজেই প্রজেক্ট প্ল্যানিং ও বাস্তবায়নের সময় মনিটরিং করা যায়। এর ফলে কোথায় কাজ পিছিয়ে পড়ছে, কাজে খামতি কাটিয়ে ওঠার ব্যাবস্থা নেওয়া ইত্যাদি সবই করা যায় আর ব্যবহারযোগ্য সম্পদের কার্যকর প্রয়োগ করা যায়।

৩. বাজার বিশ্লেষণ (Market Analysis)

কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে মার্কেট আনালিসিস বা বাজার বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।যে পণ্য অথবা পরিষেবা বিক্রির জন্য উৎপাদন করা হবে তার পর্যাপ্ত ক্রেতা সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত থাকলে ব্যবসা গ্রাহকের উপলভ্যতা দিক থেকে স্থিতিশীল ধরা যেতে পারে।মার্কেট আনালিসিস এর ক্ষেত্রে যে সব দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে সেগুলি হলো:

- প্রস্তাবিত পণ্যের সহজলভ্য বাজারের সন্ধান তালিকাভুক্ত করা
- গ্রাহক সনাক্তকরণ
- ক্রয় ও প্রদান ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি টু পে) বিশ্লেষণ
- গ্রাহক আচরণ বিশ্লেষণ
- গ্রাহক যোগাযোগ পদ্ধতি ও বার্তা
- বিপণন কৌশল নির্ধারণ
- বিক্রয় পূর্বাভাস প্রস্তুত করা
- এবং আর সব সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র

দক্ষ বাজার বিশ্লেষণের উপর ব্যাবসার অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি যেমন উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ, লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত নেবার কার্যকলাপ নির্ভর করে।

৪. অ্যাকাউন্টস এবং ফিনান্স

যে কোনো ব্যাবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান ও সম্পদের (Resources) গুরুত্ব অপরিসীম।অর্থসম্পদ ব্যবহার

করে অন্যান্য প্রায় সব সম্পদই অর্জন করা যায়। যে কোনো ব্যাবসার উন্নতির মাপকাঠি

১. লাভ উপার্জন ও

২. ধারাবাহিক শ্রীবৃদ্ধি

তাই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাবপত্রের বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্য জানা এবং বোঝা একজন উদ্যোগকারীর কাছে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় যাতে প্রতিষ্ঠানের সুবিধার স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত সময়মতো নেওয়া যায়।কারণ কোনো সংস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সচ্ছলতা বজায় থাকলে তবেই ভালোভাবে তার কাজ এগোতে পারে এবং প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু কাজের কথা ভাবতে পারে।

কোনো ব্যাবসায় পরিষ্কার এবং দক্ষ একাউন্টিং ও ফিনান্সিয়াল সিস্টেমের অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ:

- স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ প্রণালী (অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম) উদ্যোগীকে আর্থিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাবসার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আয়, ব্যায়, লাভ, লোকসান, সম্পদ(Asset) ও দায়ের (Liability) বিবরণ অবহিত করে যাতে উদ্যোগী আরও ভালভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে । হিসাবরক্ষণের মডেল প্রতিবেদনগুলি ব্যাবসার আর্থিক স্বাস্থ্য যেমন লাভ বা ক্ষতির পরিমান, ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা, মূল কাজের মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণ ইত্যাদি উপস্থাপন করে।
- ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যে কোনও সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ।প্রতিষ্ঠানের উদ্দিষ্ট কাজ সফলভাবে

করার এবং সংস্থার কাজকর্ম দক্ষতার এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়

- তহবিলের ব্যবস্থা করা,
- তহবিলের সুব্যবহারের দিকে নজর রাখা,
- হিসাব সংরক্ষণ ও আয় ব্যায় সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তদারকি করা
- ঝুকি মূল্যায়ন এবং
- অর্থ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া,

এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

যে কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে আর্থিক সংস্থান ও তার ব্যবহার না করা হলে প্রতিষ্ঠানকে কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।যার ফলে সংস্থার উন্নতি এবং অগ্রগতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

৫. সামাজিক দায়িত্ব পালন

এই আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম যে একজন উদ্যোগীর কাছে সমাজের কিছু প্রত্যাশা থাকে।উদ্যোগীকে কাজ করার সুযোগ করে দেবার ক্ষেত্রে সমাজের অনেক অবদান থাকে। যেমন কোন কারখানা স্থাপন করার জন্য দোরগোড়াতে বিদ্যুতের, জলের, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপস্থিতি ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সমাজের করদাতাদের টাকা খরচ হয়। শিল্পের কাঁচামাল, উৎপাদনের উপাদান ইত্যাদি প্রকৃতি থেকেই কোনো না কোনোভাবে সংগ্রহ করা হয় - সমাজের মানুষ বা বাস্তুতন্ত্রকে যার মাসুল গুনতে হয় ইত্যাদি।

তাই ব্যবসাকে সমাজের ঋণশোধ করার দায়িত্বও হয়।

কর্মসংস্থান-এর ব্যবস্থা করা, অনুন্নত সম্প্রদায়কে সাহায্য করা, দুঃস্থ মহিলাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা.....এসব সমাজকে উদ্যোগ থেকে কিছু ফেরত দেবার উপায়।

এ বিষয়ে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক ব্যায় ও লাভের মূল্যায়ন করার নাম "সোশ্যাল কস্ট বেনিফিট এনালিসিস"।একটি উদ্যোগ স্থাপনের এবং সংস্থার কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণগতভাবে সমাজকে কত অর্থ ব্যায় করতে হয় এবং উদ্যোগের কাজকর্মের মাধ্যমে সমাজ কত অর্থ ফেরত পায় তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে হিসাব করা হয়।

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ অবশ্যই আশা করবে লাভবান হতে কারণ সামাজিক পরিকাঠামো সৃষ্টির জন্য যে বিশাল বিনিয়োগ সমাজ করে তা ফেরত দেবার দায়িত্বও উদ্যোগীর উপর বর্তায়।

৬. পরিবেশ রক্ষা

উত্তম জীবনধারণ এবং উপার্জনের স্বার্থে পণ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কৃষিকার্য, পরিবহন শিল্প, পর্যটন শিল্প এসব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।কিন্তু কখনোই তা বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতার সঙ্গে আপস করে করা যায় না।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবজাতির নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন সুরক্ষিত এবং স্থিতিশীল বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বাসস্থান ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফলে পরিবেশ, মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের কি রকম ক্ষতি হয় তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম:

পাঞ্জাবের সবুজ বিপ্লব:

স্বাধীনতার কিছু সময় পর ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের বিভিন্ন জাতের চাষের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করা হয়েছিল।ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর এই প্রচেষ্টা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছিল।ভারত সরকার এই কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন এবং সবুজ-বিপ্লব পরবর্তী কালে চাল, গম, ডাল, এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো।ভারতবর্ষ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়েছিল। সবুজ বিপ্লব প্রকল্প পাঞ্জাবে প্রথম চালু করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের মধ্যে, পাঞ্জাব দেশের মোট খাদ্যশস্যের ৭০% উৎপাদন করছিল, এবং কৃষকদের আয় ৭০% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাঞ্জাবকে দেশের ফুড বাস্কেট হিসাবে চিহ্নিত করা।হলো। এ পর্যন্ত খুবই ভালো ফল। আবিষ্কার ও প্রয়োগের স্বীকৃতিস্বরূপ ডঃ নরমান বোরল্যাউগ ১৯৭০ সালে নোবেল প্রাইজ পেলেন , ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হলেন।

এরপরের পরিস্থিতি

পরবর্তীকালে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেলো প্রচুর পরিমানে কীটনাশকের ব্যবহার, রাসায়নিক সারের অত্যধিক এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার জলাশয়গুলিকে বিষাক্ত করে জলজ প্রাণী, উদ্ভিদসমূহ, উপকারী পোকামাকড় এবং বন্যজীবকে হত্যা করেছে।

সময়ের সাথে সাথে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গগুলি অভিযোজনের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে পরিণামে

কৃষক আরো বেশিকরে বিষাক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেছে।এর ফল হয়েছে মারাত্মক।

চাষের ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমি, বায়ুমন্ডল, জলভাগ সহ পুরো পরিবেশটাই দূষিত হয়ে গেল।খাদ্য সুরক্ষা সুরক্ষিত করার মাসুল পাঞ্জাব আজ গুনছে - বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ ও শারীরিক ব্যাধি, যেমন ক্যান্সার, রেনাল ফেলিওর, প্রসবের আগে বা প্রসবের সময় শিশুর মৃত্যু, জন্মগত ত্রূটি সমেত শিশুর জন্ম ইত্যাদি পাঞ্জাবের সামাজিক ব্যবস্থাকে বড় সমস্যা আর দুর্ভাগ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

গাছপালা, জলাশয় ও জীববৈচিত্র্যপূর্ণ কিছু পরিমান জমি অধিগ্রহণ করে যখন একটা শিল্পতালুক তৈরী করা হয়, সে স্থানের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র জমির ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রভাবিত হতে থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ গাছপালার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কার্বন বিচ্ছিন্ন করে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি করে যা প্রাণীকুলের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।একটা পরিমাণগত উদাহরণ দিচ্ছি - পাইন, ইউক্যালিপটাসের ইত্যাদি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের গাছগুলি প্রতি হেক্টর প্রতি গড়ে ১০ টন কার্বন বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

জলাভূমি পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।পানীয় জলের উৎস হিসাবে কাজ করে, ভূগর্ভস্থ জল পুনঃপূরণ করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, জীব বৈচিত্র্যকে বজায় রাখতে সাহায্য করে ও বিপুল সংখ্যক লোককে জীবিকার সুযোগ করে দেয়।

জীববৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের মূল সূচক।প্রকৃতিতে অধিক সংখ্যক জীবপ্রজাতির উপস্থিতি বেশি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ প্রজাতির অস্তিত্ব চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী কারণ প্রকৃতিতে জীবকুল একে অন্যের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

একটি স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিক ভাবে জল পরিশুদ্ধ করে, বায়ু শুদ্ধ করে, মাটির উর্বরতা বজায় রাখে, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, মাটিতে উপস্থিত অণুজীব জৈব-রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে গাছপালা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পুষ্টির পুনঃসৃষ্টি করে এবং আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে।চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের কাঁচামালও এই প্রকৃতির বিভিন্ন ওষধি গুল্ম থেকেই সংগ্রহ করা হয়। আমরা এই "বাস্তুতন্ত্র পরিষেবাগুলি" ছাড়া বাঁচতে পারি না। শিল্পায়ন, নগরায়ণ করতে গিয়ে আমরা পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করি।যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়।ভবিস্যত প্রজন্মকে অনেক বেশি মাত্রায় দুর্ভাগ্যের সাম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে কাজ করতে হবে।একটা শিল্প স্থাপন করতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতেই হবে কিন্তু প্রকৃতির যে ক্ষতি হচ্ছে তার পূরণের দায়িত্বও নিতে হবে।সযত্নে পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment) করতে হবে।প্রতিটি পরিবেশগত উপাদানের পরিমাণগত ক্ষতির হিসাব করে সেটা পরিপূরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে।।

সমাপ্তি মন্তব্য

উদ্যোগ স্থাপনের সময় সাধারণভাবে উপরে বলা বিষয়গুলির দিকে নজর রেখে এগোলে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অনেকটাই নিশ্চিত করা যায়।



সিভিল।WBIDC থেকে অবসরপ্রাপ্ত। স্ত্রী সীমা, ভূগোলে স্নাতক, পরিবারের জীবনধারণের অবলম্বন। ছেলে: সূর্যাশীস সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে কর্মরত।



Cyber-Crime Awareness And How To Be Safe I Aritra Mazumdar

Any unlawful act committed by a person with the intent on causing bodily or monetary harm to the victim and is punishable by law is called a crime. A crime may be harmful to a person, society or a country as a whole. Sir CK Allen defines crime as an act which directly or indirectly causes harm to the society in a serious degree. Similar to conventional crimes cyber-crimes also harm an individual or an organisation however the key elements are different from conventional crimes. Any computer-generated space is known as cyber space, so any crimes committed within the realm

of cyber space with the intention to cause harm to the victim is known as cyber-crimes. With the growth in the use of internet these days the cyber-crimes are also increasing at an alarming rate. Cyber Crimes fall under the Information Technology Act,2000 (IT Act). Since, these days we use cyber space on a daily basis to conduct our activities such as social media, banking, conducting transactions etc lead to a sharp spike in the cyber-crime cases as per the National Crime Records Bureau.

The types of most common and infamous cyber-crimes in India are as follows:

- Cyber Crimes that include control of one's computer system without their knowledge like Hacking into the victim's computer system or of any app. Punishable under **Sec 66 of the IT Act.**
- Crimes that include malicious schemes on the net like Phishing to scam people. Phishing is a type of scam where the offenders create a fake

website disguised as a well-known brand to trick victims into clicking the link and thereby extracting the data of the victim. **(Section 66)**

- Salami or other malware attacks where the offender attaches virus or malware in an email or message which is aimed to corrupt the computer system.
- Posting or sending obscene or lewd materials in the net is an offence under **Section 67 of the IT Act.**
- Identity theft comes under **Section 66{c}of the IT Act**. The offender uses the victim's identification to commit fraudulent activities and can also harm the reputation of the victim.
- **Section 66 E of the IT Act** also deals with cases regarding revenge porn which is a growing trend amongst cyber criminals these days.
- **Section 67A of the IT Act:** This section specifies the punishment for someone who has indulged in publishing and transmitting sexually explicit act in electronic form. The

punishment for such act for first time offender is imprisonment which can extend up to 5 years and a fine which extend to Rs 10 lakhs. If it is his second time conviction then a rigorous imprisonment of 7 years and a fine of Rs 10 lakhs

- **Section 72 of the IT Act:** Breach of confidentiality and privacy. This happens when the offender hacks into any system thereby breaching confidentiality and privacy of the victim.
- **Section 66F of the IT Act** deals with cases pertaining to cyber terrorism and threats in national security of the country.

What Measures Can Be Taken To Reduce The Risk Of Cyber Crime:

With the ever-increasing trend of cyber criminals harming victims through the net it is of utmost importance for the citizens to be well informed about it in order to curtail the ever-increasing trend of cyber-

crime. Unfortunately, as per National Crime Records Bureau (NCRB) data only 4% of the Cyber Crime Cases go reported which is a worrying factor. Not just individuals even companies and Government agencies are under constant cyber-attack by hackers. In 2019, hackers from Pakistan had hacked important government websites of Indian Railway etc. Hacktivist have also hacked Bank of America by sending ransomware attacks within its software system and thereby corrupting the same. The number of cyber-attacks world-wide has increased 67% during the pandemic. Since, most of our daily lives including monetary transactions are made using the cyber realm the need and measures to protect oneself is of utmost importance.

Thus, data protection and cyber security measures is the key to avoid such attacks. People must also be aware of the legal remedies they have available in their arsenal to combat when they fall victim to Cyber Crime.

- Companies and individuals should invest in proper cyber security software tools to protect themselves from ransomware attacks.
- Citizens should never give someone their bank details or any other information which are important to a stranger at phone calls as this type of fraudulent calls are regular in India.
- Citizens must not click any suspicious links in the world wide web as it may be a front for illegal data mining.
- When cyber-crime happens, the citizen must immediately file a FIR on the Cyber Crime Portal of the respective place where he resides or at National Cyber Crime Reporting Forum.
- Consult a Cyber Crime speciality Lawyer to help one navigate the nuances of cyber-crime.
- Spread Awareness of cyber-crimes as this important issue which had been largely overlooked.



Aritra is son of Samrat Mazumdar (Mechanical).He is an Advocate at Calcutta High Court dealing with , Cyber Law, IPR, Matrimonial Dispute,Civil law.



সবিনয় নিবেদন । Trivia

1. আপাতত ম্যাগাজিনটি www.archive.org তে[আপলোড করা হবে, যতদিন না কোনো ভালো বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে। www.archive.org থেকে যে কোন সময় ম্যাগাজিনটি ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে।
2. বি কলেজ ১৯৮২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা এবং তাদের পরিবারের লোকজন এখানে তাদের লেখা-ছবি পাঠাতে পারবে।
3. গল্প, গদ্য, কবিতা, ক্যামেরায় তোলা ছবি, স্ক্যান করা চিত্রকর্ম, রেসিপি গ্রহণযোগ্য।লেখার ক্ষেত্রে, সীমা ২০০০ শব্দ।
4. আপাতত ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা গ্রহণ করা হবে
5. ফটো JPEG ফরম্যাটে সর্বাধিক 2.5 MB পাঠাতে হবে।
6. ফোটোর ক্ষেত্রে, দু-এক বাক্যে বিবরণ দিতে হবে।ব্যবহৃত ক্যামেরা, লেন্স ইত্যাদি জানালে ভালো হয়।
7. লেখা/ছবি র সঙ্গে, একটা সেলফি আর পাঁচ বাক্যে একটা পরিচিতি পাঠাতে হবে।পরিবার/ বর্তমান নিবাস/ শেষ/বর্তমান কর্মস্থল ইত্যাদি
8. যাবতীয় লেখা ছবি একমাত্র ইমেইলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রাক্তনীদেরই ইমেল করতে হবে।ইমেল আইডি bec82alumni@gmail.com. MS Word বা Google Doc ফাইলে লেখা জমা দিতে হবে
9. যেহেতু বাংলা লেখার ক্ষেত্রে, ফন্ট অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে, তাই সাধারণত যে কোনো, ইউনিকোড ফন্টে বা Solaimanlipi বা Kalpurush ফন্ট ব্যবহার করতে। হবে এই ফন্ট গুলো ডাউনলোড করা যাবে https://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html

10.যেকোনো লেখা, সম্পাদকীয় টিমের বিবেচনায় বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হলে, তার সম্পাদনা বা গ্রহণ-বর্জনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পাদকীয় টিম নেবে

11.ই-ম্যাগাজিন প্রকাশের অন্তর দ্বিতীয় সংখ্যার পর থেকে ঠিক করা হবে

1. The magazine will be initially uploaded in www.archive.org till a better accessible and archival alternative is available. The magazine as pdf can be downloaded any time.
2. BEC 82 batch-mates and their next-of-kin will only be eligible for contributing in the magazine.
3. Stories, Prose, Poetry, Photos, Scanned Paintings, Recipes will be in general, considered for publication. Maximum word limit for text entries will be 2000 words.
4. Contributions will be either in English or Bengali.
5. Photos will be submitted in JPEG format with maximum 2.5 MB file size.
6. All photos must accompany short text on behind-the-shoot-story and if possible details about the Camera, Lens used.
7. All submissions, text or photo, must accompany one selfie, and a five sentence (maximum) who-am-I write up with details about family/present location/ last/present professional engagement.
8. Contributions to be sent as attachment through E-mail to bec82alumni@gmail.com. No other mode of submission will be accepted.
9. All submissions must be submitted in MS Word or Google Doc file format.

10. For Bengali documents, since font compatibility may be an issue, Bengali Unicode Fonts , *Solaimanlipi* or *Kalpurush* will be preferred. These fonts can be downloaded from https://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html
11. In case of entries, which as per editorial team may raise controversies, decision of the editorial team on editing or discarding the entry will be final.
12. Periodicity of the publication may be finalized after second issue.